জীবজগতের বিচিত্র সংবাদ

হরিমোহন কুণ্ডু

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

জীবজগতের বিচিত্র সংবাদ

হরিমোহন কুণ্ডু
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

JIBJAGATER BICHITRA SAMBAD
[Wonderful news of Animal World]
Harimohan Kundu

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম মুদ্রণ—অকটোবর, ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন, (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক ঃ
দীপ্তি প্রিণ্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

মূল্য ঃ আট টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব
ডাঃ তুলসী চরণ কুণ্ডু
ও মাতৃদেবী
শ্রীমতী শান্তিলতা কুণ্ডুর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রদ্ধেয় নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ ক'রে একটি সংকলন প্রকাশের উপদেশ দেন। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য সুখপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে 'জীবজগতের বিচিত্র সংবাদ' নামক এই সংকলন প্রকাশে প্রয়াসী হলাম। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রভাতী কুণ্ডুর সক্রিয় প্রচেষ্টায় প্রবন্ধগুলি সংকলিত হলো। পাঠকেরা আনন্দ পেলে ধন্য হবো। এই সংকলনের অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্বে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ উৎসাহিত করায় আমি ঐ সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

লেখক

মহালয়া, ১৩৯৪

সূচীপত্র

নীল সাগরের তল

পৃথিবীর ভৌগোলিক গঠনপ্রকৃতি চির রহস্যময়। এর মাটি পাথরে গড়া অংশটার কথা বাদ দিলে, বাকী থাকে সমুদ্রের বিশাল জলরাশি, চিরতুষারাবৃত মেরু অঞ্চল আর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে এক অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অভিযান হলো গ্রহান্তর যাত্রা। মানুষ আজ পৃথিবীকে ছেড়ে চাঁদে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, যে পৃথিবীতে সৃষ্টি হল মানুষ নিজে, শত শত বছর ধরে যেখানে তার বিচরণ, সেই পৃথিবীর সব কিছু আজও তার জানা হয়নি। মাঝে মাঝে শোনা যায় তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলিতে আজও নাকি তুষারমানবেরা বিচরণ করে। অভিযান হয়েছে কতবার, কিন্তু আজও তাদের সন্ধান মেলেনি। চিরতুষারাবৃত পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যদিও মানুষ তার বিজয়পতাকা উড়িয়ে এসেছে তবুও সেখানকার ভূ-প্রকৃতি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রহস্যময় আবহাওয়া এবং জীবজন্তুদের জীবন ধারণের পদ্ধতি আজও মানুষের বহুলাংশে অজানা। তেমনি অজানা রয়েছে পৃথিবীর বিশাল সমুদ্র, যা' পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে অবস্থান করছে।

সমুদ্রের গঠন, অবস্থান, বিশাল জলরাশির উত্তাল ঢেউ, সবই যেমন অবাক করে দেয়, তেমনি অবাক করে তার বাসিন্দারাও। চোখে দেখা যায় না এমন-সব মাইক্রোস্কোপিক উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে সুরু করে বর্তমান পৃথিবীর সব চেয়ে বৃহত্তম জন্তু 120 ফুট দীর্ঘ তিমি মাছ পর্যন্ত এর বাসিন্দা। পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু ভূ-পৃষ্ঠতল এভারেষ্টের চূড়া 2900 হাজার ফুট উঁচু। আর সমুদ্রের মধ্যে সবচেয়ে গভীর হলো প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, যার তল পেতে হলে যেতে হবে 37800 ফুট নীচে, অর্থাৎ 7 মাইলেরও বেশী। শব্দের প্রতিধ্বনি দিয়ে যদিও তার দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। তথাপি সেই গভীর তলদেশ আজও রয়ে গেছে গেছে অনাবিষ্কৃত।

সমুদ্রের গভীরতা ও গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী সমুদ্রকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

(1) সমুদ্রের তীরভূমি থেকে 25/30 মাইল পর্যন্ত যেখানে জলের গভীরতা 400 হাতের বেশি নয় (100 Fathom), সে অংশকে বলে মহীসোপান বা Continental shelf. এই অংশের জলরাশি সাধারণতঃ তীরভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়ে, তাই একটু ঘোলা। সূর্যের আলো প্রায় এই ঘোলা অংশের

তল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই এই অংশে নানারকম জলজ উদ্ভিদ জন্মে। সামুদ্রিক প্রাণীদের শতকরা নব্বই ভাগই এই অংশে বিচরণ করে।

(2) মহীসোপানের পর সুরু হয় কমবেশী ঢালু অংশ, যেটা গভীর তলদেশে গিয়ে শেষ হয় এবং 500 হাত থেকে 8000 হাত পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই অংশকে বলে Continental Slope.

(3) পরবর্তী অংশ থেকে একেবারে তল পর্যন্ত বলা হয় গভীর সমুদ্র বা Abyssal Realm.

(4) এছাড়া মাঝ সমুদ্র, যেখানে সমুদ্রের তল দেখা যায় না অথচ সূর্যের আলো 400 হাত পর্যন্ত গভীরে বিস্তৃত সেই বিশাল উন্মুক্ত সমুদ্রকে বলে Pelagic Realm.

সমুদ্রের তল সবটাই সমতল নয়। কোথাও উঁচু নীচু পর্বত শ্রেণী, আবার কোথাও বিরাট বিরাট ফাটল, আবার কোথাও বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা। ফাটলগুলির গভীরতা যেমন সবচেয়ে বেশী তেমনি পর্বতশ্রেণীর উচ্চতাও নেহাত কম নয়। যে পর্বতগুলির উচ্চতা অনেক বেশী তারাই কেবল সমুদ্রের জলের উপর মাথা তুলে আছে। এমনিভাবেই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সমুদ্রের তল থেকে উঠে আসা পর্বত শ্রেণীর উপর ফিলিপাইন ও জাপান দ্বীপপুঞ্জ গড়ে উঠেছে।

সমুদ্রের জল লবণাক্ত। এই লবণ এসেছে পৃথিবীর মাটি ও পাথর থেকে। পৃথিবীর মাটি ও পাথর যে সকল ধাতুজ পদার্থ দিয়ে তৈরী সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে অথবা সমুদ্রের ঢেউয়ের ঘর্ষণে তীরভূমিকে গুঁড়িয়ে সমুদ্রের জলকে করেছে লবণাক্ত। সুতরাং পৃথিবীর মাটি পাথরে যত রকমের খনিজ পদার্থ আছে সমুদ্রের জলেও রয়েছে তত রকমই।

সমুদ্রের জলের উপরিভাগে সব সময়েই দেখা যায় প্রচণ্ড ঢেউয়ের তাণ্ডব। এই ঢেউয়ের কারণ হল যেহেতু পৃথিবী ঘুরছে, তাই তার ওপরের জলটাও ঘুরপাক খেয়ে ঢেউয়ের সৃষ্টি করছে। এর উপরে আছে সামুদ্রিক ঝড়। তাছাড়া সমুদ্রের যে অংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত সেখানকার জল গরম ও হালকা হয়ে সরে যেতে চায় হিমমণ্ডলের দিকে, এবং হিমমণ্ডলের ঠাণ্ডা ও ভারী জল তলিয়ে যেতে চায় নীচের দিকে। তাই তাদের ঠেলাঠেলিতে সুরু হয় ঢেউয়ের তাণ্ডব।

রহস্যঘন সমুদ্রের সবচেয়ে রহস্যময় হল গভীর সমুদ্র। মানুষের চাঁদে যাওয়া সম্ভব হলেও আজও এই গভীর সমুদ্রের সব রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হয়নি। তার একমাত্র কারণ জলের চাপ। প্রতি 4000 হাত গভীরতায় এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে জলের চাপ পড়ে এক টন অর্থাৎ 27 মনের মত। সুতরাং কোন মানুষ যদি মাত্র 4000 হাত গভীর সমুদ্রে নামে তাহলে

তার সর্বাঙ্গে কতটা পরিমাণ চাপ পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ ঐ গভীরতাতেই মানুষ একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। তাইতো সমুদ্রে ডুবুরিরা পর্যন্ত অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পোষাক পরেও তিনশ ফুটের বেশী গভীরতায় যেতে পারে না। এ পর্যন্ত কোন জলযানের পক্ষেও দু-মাইলের বেশী গভীরতায় যাওয়া সম্ভব হয়েছে কিনা জানা নেই। সুতরাং চাঁদে যাওয়া সম্ভব হলেও 7 মাইল গভীর প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ আজও সমুদ্র অভিযাত্রীদের স্বপ্ন হয়েই রয়েছে।

এর উপর গভীর সমুদ্র হল ভয়াবহ তমসাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো জলের মধ্যে বড় জোর 400 হাত পর্যন্ত যেতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে যত গভীর তত অন্ধকার এবং তত কনকনে ঠাণ্ডা। আর সমুদ্র যত গভীর, সমুদ্রের জল তত স্থির। অথচ উপরে ঢেউয়ের তাণ্ডব। সুতরাং নিশ্চল, স্থির, ঘোর অন্ধকারে কনকনে ঠাণ্ডা জল একদিকে যেমন অভিযাত্রীদের পথকে করেছে দুর্গম অন্যদিকে সৃষ্টি করেছে অপরিসীম কৌতূহল।

গভীর সমুদ্র আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক বিশেষ বাস্তুরীতি (Ecosystem) রচনা করেছে। গভীর সমুদ্রের এই পরিবেশ দুটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত। মহীসোপানের পরবর্তী গভীর সমুদ্রকে বলে Archibenthic Zone এবং তার নীচে সমুদ্রের মহাতলকে বলা হয় Abyssal Zone. বস্তুতপক্ষে সমুদ্রতলের এই দুটো অঞ্চলকেই একত্রে গভীর সমুদ্র (deep sea) বলা হয়।

গভীর সমুদ্রের বাস্তুরীতির সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল অপরিবর্তনীয় পরিবেশ। এখানে সময় যেন থেমে আছে। এখানে দিনরাত্রির আবির্ভাব ঘটেনা। নিকষ কালো গভীরতায় সূর্যালোক প্রবেশ করেনা। তাই চির অন্ধকার নিশা কাটিয়ে আলোকোজ্জ্বল দিনের আবির্ভাব ঘটেনা। নেই কোন ঋতু বদলের পালা। তাই এখানকার অধিবাসীরা পরিবর্তনহীন পরিবেশের বাসিন্দা। এখানকার জীবমণ্ডলের সবচেয়ে বড় কথা হ'ল যেন এক বিরাট গোপনীয়তার মধ্যে নিঃশব্দ জীবনযাপনের গ্লানিতে জীবের স্বভাবসিদ্ধ বৃদ্ধি অনন্তকাল ধরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে। পরিবেশ অনুযায়ী এ হ'ল একমুখীনতার ফলশ্রুতি। বিশেষ অবস্থার মধ্যে গড়ে উঠা এই একমুখী পরিবেশ পরিবেশতত্ত্বের একটা সূত্র সাধারণভাবে মেনে চলে। এই সূত্র Theinemann's Principle নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুসারে "কোন বিশেষ স্থানের পরিবেশ যতবেশী একমুখী, সেই অনুসারে জীবসমূহ বিশেষত্ব লাভ করে এবং সেখানে প্রজাতির সংখ্যা তত কম হয়; কিন্তু একক প্রজাতির জনসমষ্টি সংখ্যায় বেশী হয় ও বিস্ময়কর রকমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়।"

সংক্ষেপে, গভীর সমুদ্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল, প্রচণ্ড জলের চাপ, গভীর অন্ধকার, তাপমাত্রা অতি নিম্ন এবং খাদ্যের অভাব। এ সব থেকে

স্বভাবতই একটা কথা বলা যায় যে এখানকার পরিবেশ জীব জগতের অস্তিত্বের পক্ষে আন্তঃগ্রহ মহাকাশের পরিবেশের মতই একান্তভাবে প্রতিকূল।

অগভীর সামুদ্রিক প্রাণীদের কিছু অংশ গভীর সমুদ্রে নেমে এসে এখানকার বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার উপযোগী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজও কোন সুনির্দিষ্ট বাস্তুরীতি গড়ে ওঠেনি। তাই এখানকার বাস্তুরীতি আজও অসম্পূর্ণ (Incomplete Ecosystem)।

এখন প্রশ্ন হল কি আছে ওখানে? কিছু দিন আগেও ধরে নেওয়া হত গভীর সমুদ্রে উদ্ভিদ বা প্রাণীদের অস্তিত্ব অসম্ভব। ঐ অন্ধকারে গাছপালা তো থাকতেই পারে না; বোধ হয় প্রাণীরাও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের গভীর অনুসন্ধিৎসা থেমে নেই। তাই আপাততঃ জানা গেছে গাছপালা না থাকলেও অন্ততঃ তিন মাইল গভীরতা পর্যন্ত বিচিত্র ধরনের প্রাণীরা বিচরণ করে। বিশেষ করে বিচিত্র ধরনের মাছ। মাছ ছাড়া দেখা কিছু এককোষী প্রাণী, স্পঞ্জ, কিছু অঙ্গুরীমাল, সন্ধিপদী, মোলাস্কা ও কণ্টকত্বক পর্বের প্রাণী।

যেহেতু সেখানে অন্ধকার তাই অধিকাংশ মাছও অন্ধ; কোন কোন মাছের অবশ্য খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেলিস্কোপিক চোখ দেখা যায়। তাই অধিকাংশ মাছের দেহ থেকে নানারকমের আলো বিচ্ছুরিত হয়। যে সমস্ত মাছের দৃষ্টিশক্তি অল্প ঐ আলো তাদের পথ দেখায়। যারা একেবারেই অন্ধ তাদের দেহের ঐ আলো শিকারকে আকর্ষণ করে। তাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবকে পূরণ করে স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শের দ্বারাই তারা সব কিছু বুঝতে পারে। তাপবিহীন ঐ আলো উৎপাদনকারী যন্ত্রগুলিকে বলে Phosphorescent organs. যন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে পারে। যেমন মাথার উপর, চোখের পাশে, নীচের চোয়ালে, শুঁড়ের অগ্রভাগে, তলপেটে অথবা লেজে। এই যন্ত্রগুলি হল চামড়ার উপর অবস্থিত এক ধরনের রূপান্তরিত গ্রন্থি যা থেকে তৈলাক্ত Phosphorescent mucous নির্গত হয়। এই mucous শরীরের বাইরে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে জোনাকীর মত তাপবিহীন আলোয় রূপান্তরিত হয়।

গভীর সমুদ্রের কোন কোন মাছের দেহে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র থাকে। ঐ যন্ত্র কখনও মাথার দু'পাশে অথবা পেটের তলায় অথবা লেজে অবস্থান করে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলি সারিসারি সাজান লম্বা টিউবের মত এবং আড়াআড়ি কতকগুলি পর্দা দিয়ে এমনভাবে খণ্ডিত যেন কতকগুলো প্রকোষ্ঠ একটির পর একটি সাজান। এই প্রকোষ্ঠগুলি একটি আঠার মত পদার্থ দিয়ে ভর্তি। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মাঝে একটি পাতলা পর্দা আছে, যেটি তামা অথবা দস্তার মত ইলেকট্রিক প্লেটের কাজ করে। প্লেটের যেদিক দিয়ে স্নায়ু বা নার্ভস্ প্রবেশ করে সেদিকটা Electronegative এবং বিপরীত দিক Electroposi-

tive. এই যন্ত্রের সাহায্যে এরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং শত্রু অথবা শিকারকে শক্‌ দিয়ে অক্ষম করে ফেলে। কোন কোন মাছ এত বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে যা নাকি মানুষের মত বড় বড় প্রাণীকেও শক্‌ দিয়ে কাবু করে ফেলে।

গভীর জলের মাছেদের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল জলের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা। যে সমস্ত মাছের পটকা নেই তারা সাধারণতঃ 2000 হাতের নীচে যায় না। যাদের পটকা আছে তাদের পটকা মধ্যস্থিত গ্যাস এত বেশী ঘনীভূত হয়ে থাকে যার ফলে ঐ চাপ সহ্য করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাদের মস্ত বিপদ হল যদি কখনও বেড়াতে বেড়াতে অথবা খাদ্যের সন্ধানে উপরের দিকে কিছুটা উঠে আসে তখন ঐ গ্যাস কমতি চাপের জন্য ফেঁপে যায় এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না। তখন সোজা রবারের বলের মত উপরের উঠে আসে এবং পেট ফেঁপে মরে যায়। কম চাপের জন্য চোখগুলোও যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।

গভীর সমুদ্রের মাছেদের শরীর তত মাংসল নয়। শরীরগুলি রোগা রোগা। হাড়গুলিও সরু, ক্যালসিয়ামের পরিমাণও কম। তীরে এনে দেখা গেছে হাড়গুলি সহজে একটির সঙ্গে আর একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

গভীর সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত বড় জন্তুরা ছোট জন্তু খায় এবং ছোট জন্তুরা খায় ডায়টম নামক এককোষী উদ্ভিদ। যত গভীরে যাওয়া যায় তত বড় প্রাণীর সংখ্যা কম। শুধু দেখা যায় বিচিত্র এককোষী উদ্ভিদ 'ডায়াটম,' যাদের কোষ-প্রাচীর পাতলা কাঁচের মত এবং বিচিত্র ধরনের নক্সা কাটা। আরও গভীরে কি আছে তা এখনও অজানা।
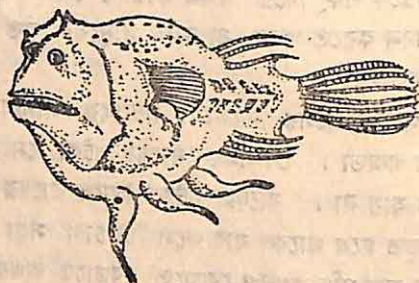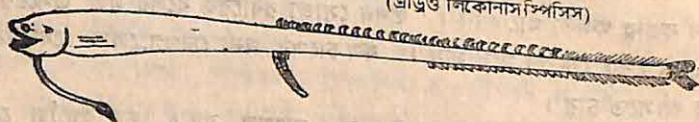
চিত্র নং 1
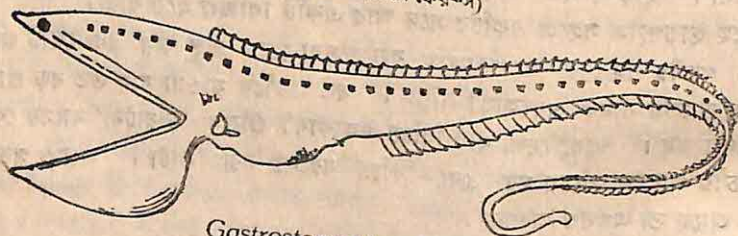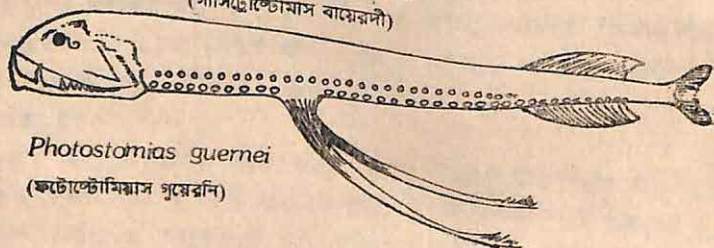
নীল সাগরের তল

সমুদ্র ও মরুভূমির প্রাণীদের পানীয় সমস্যা ও সমাধান

জলের অপর নাম জীবন। প্রাণী দেহের ওজনের শতকরা 70 থেকে 95 ভাগই হ'ল জল। দেহের মধ্যে বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় জল অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তাই জীব সব সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় জল দেহের মধ্যে রেখে প্রাণীরা উদ্বৃত্ত জল রেচন পদার্থ সহ প্রস্রাব আকারে বের করে দেয়। একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী সারাদিনে প্রায় তিন লিটার জল পান করে এবং তার মধ্যে দেড় লিটার প্রস্রাব আকারে বের করে দেয়।

সামুদ্রিক প্রাণীদের পানীয় জল সমস্যা : পৃথিবীর উপরিভাগের 4 ভাগের তিন ভাগ স্থান হল জল বেষ্টিত। বিপুল এই জলরাশির অধিকাংশই থাকে সমুদ্রে, যেখানে অজস্র প্রাণী বাস করে। অথচ এই জল একেবারে অপেয়। কারণ সামুদ্রিক জল লবণাক্ত। এক লিটার ঐ জলে প্রায় 35 গ্রাম লবণ থাকে, যার মধ্যে 27 গ্রাম হল সোডিয়াম ঘটিত লবণ। এই জল যদি পান করা হয়, তাহলে প্রতি লিটারে 27 গ্রাম সোডিয়াম লবণ দেহে যাবে এবং অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় (osmosis) রক্ত ও কলারসে (Tissue fluid) প্রবেশ করবে। এত বেশী লবণ দেহের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কারণ অধিকাংশ প্রাণীর রক্তে অথবা কলারসে সোডিয়ামের পরিমাণ শতকরা 0·5 এর চেয়ে কম। যদি খাদ্যের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করা হয়, তবে পিপাসা পায়। অতিরিক্ত মিঠা জলপানের ফলে ঐ লবণ তরল হয়ে রক্তের লবণের সঙ্গে মেশে। তখন রক্তের অতিরিক্ত জল কিডনীর মধ্যে দিয়ে পাতন প্রক্রিয়ার (filtration) মাধ্যমে প্রস্রাব হয়ে বের হয়ে যায়। সুতরাং সমুদ্রের জল পান করলে ঐ লবণকে দেহ থেকে বের না করলে মৃত্যু অনিবার্য এবং ঐ লবণকে তরল করে রক্তের সঙ্গে সমতায় আনতে যে পরিমাণ মিঠা জল পান করতে হবে, তা অকল্পনীয়। সেটা সম্ভবও নয়, কারণ সমুদ্রের মধ্যে মিঠা জল দুষ্প্রাপ্য।

সামুদ্রিক প্রাণীরা কিভাবে পিপাসা মেটায় ঃ—সামুদ্রিক প্রাণীদের রক্তে অথবা কলারসে লবণের পরিমাণ পরিবেষ্টিত জলের চেয়ে অনেক কম। অধিকাংশ প্রাণীই প্রাণীভোজী (carnivorous) সুতরাং বেশীর ভাগ জন্তুই ভক্ষিত প্রাণীদের দেহরস বা রক্ত থেকেই পিপাসা মেটায়।

তবে বিভিন্ন জন্তুর লবণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল আছে। মানুষের

পক্ষেও সামুদ্রিক প্রাণীর রক্ত বা দেহরস থেকে পানীয় জল আহরণ করা সম্ভব কি? এ প্রশ্ন উঠেছিল অকূল দরিয়ায় ভগ্ন জাহাজের নাবিকদের পিপাসা মেটানোর সমস্যা নিয়ে। ফরাসী চিকিৎসক এ. বম্বার্ড উত্তরের আশায় রবারের নৌকায় চেপে একদিন পাড়ি দিলেন ইউরোপ থেকে আমেরিকায়। সঙ্গে এক ফোঁটাও পানীয় জল নেই। 65 দিন একফোঁটাও মিঠাজল পান না করে কেবল সামুদ্রিক প্রাণীর দেহরস ও মাছ খেয়ে পৌঁছালেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

মাছেরা কি জলপান করে ঃ— সমুদ্র, নদী, নালা পুকুর, ডোবা সর্বত্র মাছ বাস করে। খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ জল প্রবেশ করলেও কোন মাছই কখনও তৃষ্ণা অনুভব করে না। মিঠা জলের মাছের ক্ষেত্রে রক্তে এবং কলারসে যে লবণ ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে, তা লবণবিহীন পরিবেষ্টিত মিঠা জলের সঙ্গে অভিস্রবণ চাপের সৃষ্টি করে। ঐ চাপ 6 থেকে 10 গুণ বায়ুচাপের সমান। ফলে ত্বক এবং মুখবিবরের পাতলা আবরণের মধ্য দিয়ে মিঠা জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এই জন্যেই মাছের জল পানের প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল স্বাভাবিক নিয়মেই কিডনীর দ্বারা পাতন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এই বের হবার ব্যবস্থা না থাকলে মিঠা জলের মাছ জলের চাপে ফুলে উঠে মারা যেত। সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা। পরিবেষ্টিত লবণ জলের অভিস্রবণ চাপ দেহের রক্ত ও কলারসের চেয়ে 32 গুণ বায়ুচাপ বেশী। সুতরাং চাপের বৈষম্য অনুযায়ী সামুদ্রিক জল সমস্ত দেহরস শোষণ করে মাছটিকে শুকিয়ে দেবার কথা। কিন্তু তাতো হচ্ছে না।

সামুদ্রিক অস্থিযুক্ত মাছেরা অন্য প্রাণীর দেহরস থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে। এর মধ্যে কিছু সমুদ্রের জলও দেহের মধ্যে যায় এবং অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষা করে। তবে জলের সঙ্গে যে অতিরিক্ত লবণ প্রবেশ করে, তা বের করে দেবার জন্যে আশ্চর্যজনক পাতন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। এদের ফুল্‌কার মধ্যে আছে এক বিশেষ ধরনের কোষ। এই কোষগুলি রক্ত থেকে অতিরিক্ত লবণ ঘনীভূত অবস্থায় শ্লেষ্মার সঙ্গে বের করে দেয়।

কিন্তু হাঙর জাতীয় মাছেরা মোটেই জল পান করে না। যেহেতু এরা সমুদ্রের আদি মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং দীর্ঘদিন যাবৎ সমুদ্রে বাস করছে সে হেতু এরা সমুদ্রের জলের সঙ্গে রক্ত ও দেহরসের অভিস্রবণ চাপের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলও চমৎকার ভাবে আয়ত্ত করেছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে ইউরিয়া (Urea) নামক একরকম রেচন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এটি অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রস্রাবের সঙ্গে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু হাঙরের ক্ষেত্রে যাতে ইউরিয়া বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্য ফুলকাগুলি বিশেষ পর্দা দিয়ে ঢাকা।

ফলে রক্তে অভিস্রবণ চাপ বেশী হয় এবং সমুদ্রের জল মিঠাজলের মতই ত্বক দিয়ে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত জল কিড্‌নী দিয়ে প্রস্রাব হয়ে বেরিয়ে যায়। অভিস্রবণ চাপের তারতম্যের জন্যেই মিঠা জলের মাছ সমুদ্রে থাকতে পারে না এবং সামুদ্রিক মাছও মিঠা জলে বাঁচে না। কিন্তু ঈল (Eel), ইলিশ প্রভৃতি মাছ জীবনের কিছু সময় উভয় প্রকার জলে অতিবাহিত করে। অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষার জন্যে এদের মধ্যে দু রকমের অভিযোজন দেখা যায়।

ব্যাঙেরা কি করে ?ঃ—ব্যাঙ উভচর প্রাণী। ব্যাঙ সাধারণতঃ জলপান করে না, মিঠাজলের মাছের মতই ত্বক দিয়ে জল শোষণ করে। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক ধরনের ব্যাঙ দেখা গেছে, যারা মিঠাজলে ডিম পাড়ে, কিন্তু বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হলে সমুদ্রে যাবার পূর্বে হাঙ্গরের ন্যায় রক্তে ইউরিয়া সঞ্চয় করে রাখে, যার ফলে অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষা হয়।

সরীসৃপ ও পাখীদের সমস্যা ঃ—সামুদ্রিক পাখীরা (অ্যালবাট্রস, করমোর‍্যাণ্ট, গাল) কিন্তু কখনও মিঠা জল পান করে না। প্রজনন ঋতুতে বছরে কেবল একবার এরা তীরভূমে আসে, ডিম পেড়ে বাচ্চা তোলবার জন্যে। বাকী সময় এরা সমুদ্রেই থাকে এবং লবণ জল পান করে। সামুদ্রিক সরীসৃপ প্রাণীরাও একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সব জন্তুর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লবণ নির্গমনের জন্য দেহের মধ্যে লবণ-গ্রন্থি থাকে। পাখীদের ক্ষেত্রে এই লবণ-গ্রন্থি চক্ষুকোটরের উপরিভাগে অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে একটি সরু নালী নাকের মধ্যে উন্মুক্ত হয়। লবণ গ্রন্থি রক্ত থেকে উদ্বৃত্ত লবণ সঞ্চয় করে। এবং ঐ ঘনীভূত লবণ সর্দির মত নাক দিয়ে ঝরতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, ঐ পুরু 'সর্দি' ঊর্ধ্ব চঞ্চুর উপর ঝুলতে থাকে আর পাখী সেটাকে মাথা নেড়ে ফেলে দেয়। দেখলে মনে হবে, ঠাণ্ডা লেগে ওরা যেন ভয়ানক সর্দিতে ভুগছে।

সামুদ্রিক কাছিম, সাপ, গিরগিটির ক্ষেত্রে লবণ-গ্রন্থির নালীটি চোখের কোণে উম্মুক্ত হয়। কুমীরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শিকারকে খাবার পর চোখ দিয়ে জল পড়ে। আমাদের দেশে এটি 'মায়াকান্না' বা 'কুম্ভীরাশ্রু' প্রবাদ হিসাবে প্রচলিত। এর অর্থ হল একটা জন্তুকে হত্যা ও গলাধঃকরণ করে তার জন্যে পরে যেন শোক করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি এই 'কুম্ভীরাশ্রু'র বৈজ্ঞানিক সত্য জানা গেছে। শিকারের সময় কুমীর জলের সঙ্গে যে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করে, তা চোখের জলের সঙ্গে বের করে দেয়।

সমস্ত সামুদ্রিক সরীসৃপের ক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। সবুজ কাছিমেরা বছরের কোন এক সময়ে তীরে এসে ডিম পেড়ে আবার জলে ফিরে যায়। যাবার আগে প্রচুর চোখের জল ফেলে। দেখলে মনে হবে ভাবী সন্তানদের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে যেতে তাদের কান্না পাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কান্নার মধ্যে দিয়ে লবণ-গ্রন্থি থেকে তারা প্রচুর লবণ নির্গত করে।

মরুভূমির প্রাণীদের পানীয় সমস্যা ঃ—মরুভূমির অর্থ হল বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক জলবায়ু সমন্বিত এলাকা ; যেখানে বছরে 10"—15"-র নীচে বৃষ্টিপাত হয়, সেখানেই মরুভূমির অবস্থা বিদ্যমান। পৃথিবীর $\frac{1}{4}$ স্থলভাগের মধ্যে প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশই মরুভূমি। মরুভূমির মোট এলাকা প্রায় 1,15,00,000 বর্গমাইল। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় আটাকামা (Atacama) মরুভূমিতে কখনই বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু মরুভূমি মানেই প্রাণহীন এলাকা নয়। বহু রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রচণ্ড উত্তাপ ও একান্ত জলাভাবের মধ্যেও কঠোর জীবনসংগ্রাম করে মরুভূমিতে বাস করে। এই সব জন্তুর প্রধান সমস্যা হল পানীয় জল সংগ্রহ ; দেহমধ্যে জল সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মরক্ষা।

অধিকাংশ প্রাণী উদ্ভিদের রস, শিশিরবিন্দু এবং তাদের খাবার যোগ্য প্রাণীদের রক্ত থেকে পিপাসা মেটায়। কেউ বা মরুভূমিতে কোন রকমে কিছু জল পেলে তা ভবিষ্যতের জন্যে দেহের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আর ঘাম হয়ে কিংবা নিঃশ্বাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্প হয়ে জল যাতে বেরিয়ে না যায়, তার জন্যে চামড়ায় কোন ঘর্মগ্রন্থি থাকে না এবং নাকেও বিভিন্ন রকমের অভিযোজন দেখা যায়। কয়েকটি প্রাণীর জল সংগ্রহ পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র।

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বাস করে ইঁদুরের মত ক্যাঙ্গারু। এরা জল পান করে না। এরা খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করে বিভিন্ন গাছের শুকনো বীজ। মাটির নীচে গর্ত করে এই বীজ বেশ কিছুদিন রেখে দেয়। মাটির গভীরে ঐ বীজ মাটির জলকণা শোষণ করে। দুষ্প্রাপ্য ঐ জলকণা শুকনো বীজের মধ্যে 400—500 বায়ু চাপের সমান অভিস্রবণ চাপের সৃষ্টি করে। যতক্ষণ না বীজগুলি ভিজে নরম হয়, ততক্ষণ সেগুলি ওরা খায় না। এইভাবে মাটির নীচ থেকে খাদ্যের সঙ্গে ওরা সামান্য জল গ্রহণ করে। অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে মোলক (Moloch) নামে এক ধরনের গিরগিটি আছে। এদের ত্বক ব্লটিং পেপারের মত বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। এদের চামড়া কাঁটা এবং ছিদ্রযুক্ত। চামড়ার তলে অসংখ্য সরু সরু জলনালীর জালিকা আছে। এই সব জলনালী মাথার দিকে প্রবাহিত হয়ে মুখের কোণে দুটি থলিতে সঞ্চিত হয়। শিশির বিন্দু অথবা বৃষ্টির জল ছিদ্র দিয়ে শোষণ করে এবং জলনালী দিয়ে মুখের থলিতে জমা হয়। চোয়াল নড়লেই থলিতে চাপ পড়ে ; আর জল এসে মুখে পড়ে। তাই মোলকের জলপানের দরকার হয় না। কোন জলাশয়ে যদি একবার স্নান করে, তাহলেই অনেক জল দেহের মধ্যে সংগ্রহ করে নিতে পারে।

দেহের মধ্যে জল সৃষ্টি ঃ—একেবারে শুকনো মরুভূমিতে কিছু জন্তু (এনটোলাপ-সুশ্লিক—বিশেষ জাতীয় কচ্ছপ) কখনও জলপান করে না।

উদ্ভিদ রসই জলের প্রধান উৎস। কিন্তু প্রাণিজগতের অনেকেই দেহের মধ্যে জল উৎপন্ন করতে পারে। দৈনন্দিন জৈবিক কার্যের জন্যে যে শক্তির দরকার সেটা সৃষ্টি হয় চর্বি অথবা শর্করা জাতীয় খাদ্য জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং জলের সৃষ্টি হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃশ্বাসের সময় বের হয়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে উৎপন্ন জল প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় না। তা দেহের মধ্যে থেকে দেহের জলের প্রয়োজন মেটায়। এক গ্রাম শর্করা থেকে 0·56 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক গ্রাম চর্বি জারিত হয়ে 1·07 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর দেহে সারাদিনে 300 গ্রাম জল এভাবে পাওয়া যেতে পারে। মরুভূমির বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে এটাই হল পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। ভরত পাখী এবং কিছু ইঁদুর এইভাবেই জল উৎপন্ন করে নেয়। এরা তাই কখনও জল পান করে না। অনেক মরুপ্রাণী সেই জন্য দেহের মধ্যে চর্বি জমা করে রাখে। কিন্তু এইসব প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মে চামড়ার নীচে চর্বি জমা হয় না। তাহলে অতিরিক্ত উত্তাপে চর্বি গলে গিয়ে তাদের মৃত্যুর কারণ ঘটাতে পারে। উটের ক্ষেত্রে চর্বি জমাবার যে বিশেষ স্থান আছে তাতে 110 থেকে 120 কেজি চর্বি জমা থাকে। অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে লেজের তলদেশে চর্বি জমা হয়। উট অবশ্য পাকস্থলীর প্রাকারেও জল জমা করে রেখে দেয়। যাই হোক, চর্বি জমানো জন্তুরা খাদ্যের খোঁজে যতবেশী দৌড়াদৌড়ি করে, ততবেশী চর্বি জারিত হয়ে জল উৎপন্ন হয়। জলের খরচ সম্বন্ধেও তারা খুবই সচেতন।

তিমির কথা

বর্তমান পৃথিবীর জল ও স্থলে বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে তিমি হলো বৃহত্তম প্রাণী। দৈহিক আকৃতিতে এরা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মত বৃহৎ না হলেও বর্তমান পৃথিবীতে এদের চেয়ে বড় আর কোন প্রাণী নেই। জলচর প্রাণী হলেও এরা কিন্তু মাছ নয়। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী এবং সিটাসিয়া গণের অন্তর্ভুক্ত। এরা জলে বাস করলেও জলের উপরের বাতাসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। অন্যান্য জন্তুদের মতই স্ত্রী-তিমি সন্তান প্রসব করে এবং স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করে।

শারীরিক বিশেষত্ব ঃ—এ পর্যন্ত যত রকম তিমি ধরা পড়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নীল তিমি। নীল তিমি 100 থেকে 110 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং দৈহিক ওজন 136 থেকে 140 টনের মত।

জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, এক কালের স্থলচর চতুষ্পদ প্রাণীই ছিল এদের পূর্বপুরুষ এবং ক্রম-বিবর্তনের ধারায় বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, তিমির ভ্রূণের চারিটি পা থাকে, দেহ লোমে আবৃত এবং পিছনের লেজ থাকে না। কিন্তু জন্মাবার আগে দেহ রূপান্তরিত হয়ে অনেকটা মাছের আকৃতি গ্রহণ করে।

তিমির বিশাল দেহ এমনভাবে গঠিত যে, জলের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিচরণ করতে কোন অসুবিধাই হয় না। বিরাট মস্তক ও মুখ-গহবর তিমির দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মত। ঘাড় নেই এবং দেহটি পিছনের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। সামনের পা-দুটি সাঁতার কাটবার জন্যে প্যাড্‌ল্‌ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। পিছনের পা দেহের বাইরে আসে না—তাই দেখা যায় না। শিরদাঁড়ার উপর লম্বা মাংসপিণ্ডের একটি পাখনা থাকে। লেজটিও একটি বড় পাখনায় রূপান্তরিত হয়। চোখ দুটি দেহের তুলনায় খুবই ছোট এবং মুখের চোয়াল দুটির কোণে অবস্থিত। বাইরে কোন কান দেখা যায় না। কখনও কখনও উপরের ঠোঁটে কয়েকগাছা লোম দেখা যায়। উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহে সাধারণতঃ লোম অথবা পালক থাকে, যার দ্বারা দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়। তিমির দেহে লোম থাকে না, কিন্তু চামড়ার নীচে তিন থেকে দশ ইঞ্চি পুরু চর্বি থাকে, যার সাহায্যে তাদের দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়ে থাকে। নাকে একটি অথবা দুটি গর্ত থাকে। মাথার উপরে নাকের অবস্থান, কাজেই মাথাটি জলের উপরে তুললেই শ্বাসকার্যের জন্যে বাতাস সংগ্রহ করতে পারে। দেহের

আকার অনুযায়ী তিমি 10 থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত শ্বাস না নিয়ে জলের তলায় থাকতে পারে। যখন শ্বাস ছাড়ে, তখন নির্গত বায়ু দেহের মধ্যে অনেক সময় পর্যন্ত আবদ্ধ থাকবার ফলে খুবই উত্তপ্ত হয় এবং সমুদ্রের উপর ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে ধোঁয়ার মত ঘনীভূত বাষ্পে পরিণত হয় এবং 12 থেকে 14 ফুট পর্যন্ত ফোয়ারার মত উঁচুতে উঠে যায়। শ্বাস ছাড়বার সময় যে শব্দ হয়, তা কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। তিমির পায়ুর কাছাকাছি দু-দিকে দুটি স্তন থাকে। এটা এমন মাংসপেশী দিয়ে তৈরী, যাতে
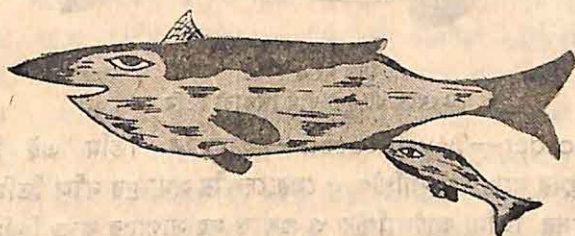
চিত্র নং 2
স্তনদানে রত 50 ফুট দীর্ঘ কুজপৃষ্ঠ তিমি

ইচ্ছামত স্ত্রী তিমি সেটাকে সংকুচিত করে বাচ্চাকে প্রচুর দুধ পান করাতে পারে। স্ত্রী তিমি সাধারণতঃ এক বছর অথবা কিছু বেশী সময় গর্ভধারণ করে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে।

তিমি মাংসাশী প্রাণী। এরা প্রধানতঃ প্রচুর পরিমাণ প্লাংকটন উদরস্থ করে এবং সময়ে সময়ে অক্টোপাস, মাছ, সীল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি প্রাণীও ভক্ষণ করে থাকে। তিমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। সাধারণতঃ ঘণ্টায় 30 থেকে
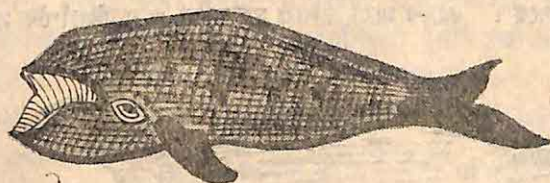
চিত্র নং 3
45 থেকে 50 ফুট দীর্ঘ রাইট তিমি

45 সামুদ্রিক মাইল গতিতে ডুবোজাহাজের সঙ্গে সমতা রেখে ছুটতে পারে। শ্বাসক্রিয়ার জন্যে বাতাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়ই জলের উপর এদের মাথা তুলতে হয়।

তিমির শ্রেণীবিভাগ ঃ—তিমির অনেক রকমের জাতিভেদ আছে। তবে তাদের মোটামুটি দুটি Sub-order-এ ভাগ করা হয়েছে।
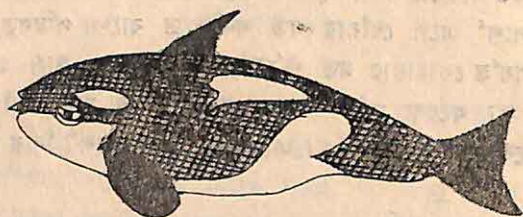
চিত্র নং 4
30 থেকে 40 ফুট দীর্ঘ শিকারী তিমি

(ক) Sub-order—'Mystacoceti—দন্তবিহীন তিমি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে আটলাণ্টিক ও মেরুদেশীয় সমুদ্রের নীল তিমি, প্রশান্ত মহাসাগরের ধূসর তিমি, আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের কুব্জ তিমি (2নং চিত্র) এবং মেরুদেশীয় সমুদ্রের রাইট তিমি (3নং চিত্র) ইত্যাদি প্রধান।

চিত্র নং 5
55 থেকে 60 ফুট দীর্ঘ স্পার্ম তিমি

(খ) Sub-order—Odontoceti—দন্তবিশিষ্ট তিমিকে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের

চিত্র নং 6
6 থেকে 10 ফুট দীর্ঘ গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন
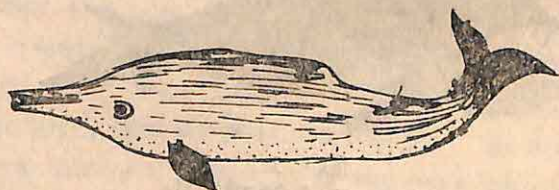
শিকারী তিমি (4নং চিত্র), প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে স্পার্ম তিমি (5নং চিত্র) এবং ডলফিন (6নং চিত্র) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডলফিন

জাতীয় ছোট ছোট তিমি পৃথিবীর প্রায় সব স্থানেই দেখা যায়। কখনও কখনও তারা মোহনা দিয়ে নদীতে উঠে আসে। ভারতবর্ষে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে প্রচুর Gangetic Dolphin দেখা যায়।

তিমির স্নেহমমতা ও মানসিকতা ঃ—তিমির ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়। এরা কখনও কখনও ঝাঁকে ঝাঁকে, কখনও জোড়া বেঁধে, কখনও বা একাকী বিচরণ করে। জোড়া বেঁধে বিচরণ করবার সময় স্ত্রী-তিমি শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ-তিমি তার সঙ্গ ছাড়ে না। মৃত্যুর পরেও অনেক সময় মৃতের পিঠে মাথা দিয়ে আঁকড়ে রাখে। বোতল-নাক সদৃশ তিমি কখনও আহত হলে সঙ্গীরা তাকে ফেলে যায় না। দশ-পনেরোটি তিমি তার শুশ্রূষায় লেগে যায়। এতে শিকারীদের সুবিধা হয় বেশী। একটিকে আহত করে তার মৃত্যুর আগেই অন্যটিকে আহত করবার সুযোগ পায়। এভাবে পুরা দলটিকে শিকার করবার সুবিধা হয়।

স্ত্রী ও পুরুষ-তিমির মিলনের সময় তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় সাধারণতঃ আড়াআড়িভাবে জলে ভাসতে থাকে এবং কখনও কখনও খাড়াভাবে পিছনের লেজের উপর ভর করে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে পাখনার সাহায্যে জলের মধ্যে এমনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যার শব্দ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

স্ত্রী-তিমির সন্তান-বাৎসল্য অতি প্রবল। হঠাৎ যদি কোন বাচ্চা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে আর রক্ষা নাই। সমুদ্রে বিচরণকারী জেলে নৌকাগুলিকে এমনিতেই তারা গ্রাহ্য করে না; কিন্তু খোঁচা দিলে বা অন্যভাবে বিরক্ত করলে তারা নৌকাগুলিকে উল্টে দিয়ে প্রতিশোধ নেয়।

ডলফিন সম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ আছে। Plutarch লিখেছেন—ডলফিন নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালবাসে। Jack Denton Scott (1955) লিখেছেন—জিল বেকার নাম্নী একটি 13 বছরের বালিকা হঠাৎ নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলফিনের পিঠে চড়ে খেলা সুরু করে দেয়। শত শত দর্শক অবাক বিস্ময়ে এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন।

প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগরের 7 ফুট থেকে 12 ফুট লম্বা ডলফিনদের মুখের গঠন এমনই যে, সব সময়ই যেন তাদের মুখে হাসি লেগে আছে। এদের শব্দগ্রাহী ইন্দ্রিয় এবং এদের বুদ্ধিও বেশ। গর্ভবতী ডলফিনের প্রসবকালে অন্য একটি স্ত্রী-ডলফিন সর্বদা তার পাশে পাশে ধাত্রী হিসাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রসবের দীর্ঘদিন পরেও ধাত্রী তিমি বাচ্চাদের যত্ন করে। এরা ঘণ্টার ত্রিশ মাইল হিসাবে ছুটতে পারে এবং সমুদ্রের জলে একরকম সাঙ্কেতিক শব্দ করে। এই শব্দের প্রতিধ্বনি অনুসরণে এরা জলের নীচে লুকানো পাহাড় পর্বত ও বিপদসঙ্কুল স্থানগুলির অবস্থান নির্ধারণ করে।

প্রবাদ আছে—সমুদ্রযাত্রী অনেক জাহাজকে এভাবে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Winthrop N. Kellog-এর মতে, এদের শব্দের প্রতিসরণ নির্ণয়ের ক্ষমতা মানুষের তৈরী যন্ত্রের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। Dr. Jhon C. Lilly টেপ-রেকর্ডের সাহায্যে এদের ভাষা অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন।

এতদিন কুকুর, বানর, পায়রা ইত্যাদি প্রাণীকে মানুষ অনেক বুদ্ধিসাধ্য কাজে লাগিয়েছেন। এবার ফরাসী প্রতিরক্ষা দপ্তর বিজ্ঞানীদের সাহায্যে ডলফিনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে জলের প্রহরীর কাজ করাবার কথা ভাবছেন। শত্রুপক্ষীয় কোন ডেস্ট্রয়ার অথবা ডুবুরী গুপ্তচর যুদ্ধ-বন্দরের আনাচে কানাচে ঘুরছে কিনা—এই সংবাদ শিক্ষাপ্রাপ্ত ডলফিন আগেই জানিয়ে দেবে। এই ব্যবস্থা সফল হলে প্রাণিজগতের এই আশ্চর্য জীবটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল আরও বেড়ে যাবে।

তিমির শত্রু মানুষ; আর তাদের স্বজাতি—শিকারী তিমি। শিকারী তিমিরা অন্যান্য বড় তিমির মুখের উপর এমনভাবে দংশন করতে থাকে যে, আক্রান্ত তিমি মুখ খুলতে বাধ্য হয় এবং জিভটি তখন কামড়ে টেনে ছিঁড়ে বের করে ফেলে। দেখা গেছে মৃত তিমিদের মধ্যে অনেকেরই জিভ নেই।

তিমি শিকার—মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তিমি শিকার করে। তিমি-শিকার যদিও প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত, তথাপি এটি ভীষণ দুঃসাহসিক কাজ। উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসের দরকার হয় তিমি শিকারে—ডাঙ্গায় বসে বন্য হস্তী, বাঘ, সিংহ শিকার সে তুলনায় অনেক সহজ।

নীল তিমির দেহে অসাধারণ শক্তি। Roy Chapman Andrews লিখেছেন—Captain Melsom একবার সাইবেরিয়ার উপকূলে তিমি শিকারের সময় তিমিটিকে গেঁথে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ঘণ্টায় 40 থেকে 45 মাইল গতিবেগে চলমান জাহাজটিকে পিছনের দিকে ঘণ্টায় 8 সামুদ্রিক মাইল গতিবেগে টেনে নিয়ে 7 ঘণ্টা ছুটে বেড়ায় (1 সামুদ্রিক মাইল 2025 গজ)। আর একবার নরওয়ের উপকূলে শিকার করতে গিয়ে তিনি বিকেল 5 টায় একটি নীল তিমিকে গেঁথে ফেলেন। সামনের দিকে পূর্ণগতিতে চলমান জাহাজটিকে আহত তিমিটা পিছন দিকে রাত 11টা পর্যন্ত টেনে নিয়ে ছুটে বেড়ায়। তারপর জাহাজের গতি অর্ধেক কমানো হলে রাত একটা পর্যন্ত জাহাজটিকে টানতে থাকে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে রাত দুটোর সময় মৃত্যুবরণ করে।

900 শতাব্দীতে সাধারণতঃ খোঁচ, বল্লম, টাঙ্গী, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে তিমি শিকার করা হতো। তীরের কাছে তিমিরা যখন শ্বাসক্রিয়ার জন্য বাতাস নিতে ভেসে উঠতো, তখন শত শত আদিবাসী শিকারী ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং

তাদের হত্যা করে তীরে টেনে আনতো। 1557 থেকে 1700 শতাব্দী পর্যন্ত বৃটিশ ও ডাচ্ শিকারীরা তিমি শিকারের জন্য বড় বড় নৌকা এবং 200 টন পর্যন্ত মালবাহী জাহাজ ব্যবহার করতো। প্রতিটি শিকারী জাহাজে 50 থেকে 60 জন লোক থাকতো এবং নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ও দাঁড় প্রভৃতি সঙ্গে নেওয়া হতো। এভাবে শিকারী জাহাজগুলি আটলাণ্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে ঘুরে বেড়াতো। পরবর্তী যুগে আমেরিকাও এই কাজে যোগ দেয়। আধুনিক যুগে নানাভাবে সজ্জিত বড় বড় জাহাজ এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

1700—1900 শতাব্দীর মধ্যে তিমিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে নূতন নূতন বন্দর ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বছরে মোট চল্লিশ হাজার তিমি শিকার করা হয়।

মানবসভ্যতায় তিমি—খাদ্য হিসাবে তিমির মাংস জাপান, নরওয়ে, বৃটেন প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের মাংসে শতকরা 98 ভাগ প্রোটিন আছে।

তিমি শিল্প পরিচালনই তিমি শিকারের মূল উদ্দেশ্য। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছোট বড় কলকারখানা। তিমি শিল্প থেকে সাধারণতঃ তিমির তেল বের করা হয়। একটি বড় তিমি থেকে প্রায় 100 ব্যারেল তেল এবং এক টনের উপর হাড় পাওয়া যায়। শিল্পে এই দুটিরই প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী এবং বাজারদরও যথেষ্ট। তিমির তেলে রান্না, বাতি জ্বালানো, সাবান তৈরী, যন্ত্রপাতি চালানো প্রভৃতি কাজ হয়। তিমির হাড় থেকে সার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

1946 সালে বিশ্বের তিমি-শিকার সংস্থাগুলির এক সভা হয় এবং তিমি-কুলকে রক্ষা করবার জন্যে শিকার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা হয়—যাতে তিমিকুল পৃথিবী থেকে একেবারে অবলুপ্ত না হয়।

সমুদ্র সুলতান

'লোমশ শীল'কে (fur-seal) সাধারণতঃ সমুদ্র সুলতান বলা হয়। শীল হল এক ধরনের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। বিজ্ঞানীরা এদের দেহের অঙ্গসমূহ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, এরা এককালে স্থলচর প্রাণী ছিল। এদের স্বভাব ছিল হিংস্র এবং এরা ছিল মাংসাশী প্রাণী।

জীব-বিদ্যায় শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে এদের কারনিভোরা বর্গের (Order—Carnivora) এবং পিনিপিডিয়া উপবর্গের (S. O.—Pinnepedia) মধ্যে গণ্য করা হয়। এরা ওটার পরিবারের (Fam.—Otaridae) অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবারের মধ্যেই হল সমুদ্র সিংহ (sea-lions) এবং লোমশ-শীল। প্রকৃত

চিত্র নং 7
স্ত্রী পরিবৃত পুরুষ লোমশ শীল
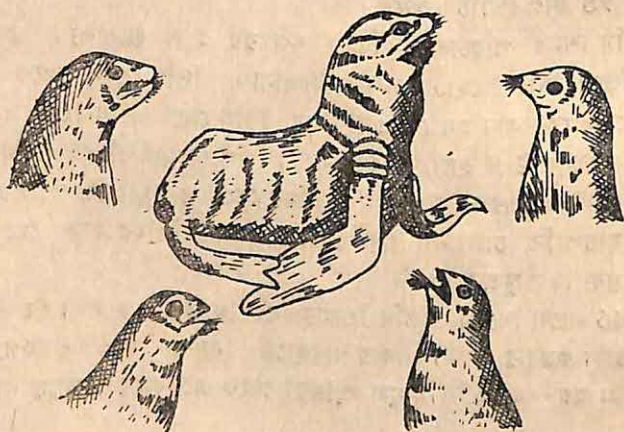
শীল ফোসিডি পরিবারের (Fam.—Phocidae) অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃত শীলদের পশ্চাদ্‌পদ লুপ্তপ্রায়, এবং তা লেজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পিছন দিকে বাঁকানো। তাই তারা ডাঙ্গায় হাঁটতে পারে না।

বর্তমানে যদিও শীল গোষ্ঠীর প্রাণীরা জীবনের অধিকাংশ সময় সমুদ্রে বাস করে, তথাপি তিমির মত এরা পুরোপুরি সামুদ্রিক প্রাণী নয়। বছরের কোন এক সময় বংশ-রক্ষার জন্যে ডাঙ্গায় আসে। দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায়

জলে বাস করার ফলে, জলজ অভিযোজনের মাধ্যমে, খানিকটা মাছের মত অঙ্গসমূহের রূপান্তর হয়েছে বটে, তবে পুরোপুরি নয়। কারণ এরা বছরের কিছু সময় ডাঙ্গাতেও বিচরণ করে।

জলে সাঁতার কাটার জন্যে দেহের আকৃতি ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে অগ্র ও পশ্চাদভাগ সরু হয়ে গেছে। সামনের ও পিছনের পদযুগলের অধিকাংশটাই চামড়ার মধ্যে আবৃত। যেটুকু বেরিয়ে থাকে, তা সাঁতার কাটার জন্যে প্যাডেল (Paddle)-এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং হাঁসের মত আঙ্গুলের ফাঁকে পাতলা চামড়া থাকে। নখ অবলুপ্তির পথে। হাতের তলে এবং পায়ের পাতায় অনেক সময় লোম থাকে। অনেকের দেহের উপরেও লোম আছে। লেজ ছোট। চোখ দুটি মাথার উপরের দিকে অবস্থিত। নাসারন্ধ্রের সামনে ভালভ্ থাকে যাতে জল ঢুকে না যায়। বহিঃকর্ণ খুবই ছোট এবং অবলুপ্তির পথে। পুরুষ-জনন অঙ্গে একখণ্ড হাড় থাকে। স্ত্রী-জনন অঙ্গ ও স্তন একখণ্ড চামড়া দিয়ে ঢাকা। দুধে-দাঁত দুর্বল ও তাড়াতাড়ি খসে গিয়ে যে স্থায়ী দাঁত বের হয় তাও মোটামুটি একই রকমের (homodont)। সুতরাং দেহের গঠন দেখলে বোঝা যায় এরা তিমির মত এখনও পুরোপুরি সামুদ্রিক প্রাণী হয়ে উঠতে পারে নি।

শীলগোষ্ঠীর অনেক প্রজাতি (species) আছে। অধিকাংশই কুমেরু অঞ্চলের বাসিন্দা। উত্তর মেরুতে যে অল্প কিছু প্রজাতির শীল আছে, এদের মধ্যে লোমশ শীলকে বলা হয় সমুদ্র সুলতান। এদের বৈশিষ্ট্য হল—পেটের তলে ঘন নরম লোম আছে। এই লোমের জন্যে এদের চামড়ার বাণিজ্যিক চাহিদা অত্যন্ত বেশী। লোমশ শীল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং আলাস্কা অঞ্চলের বাসিন্দা। পুরুষেরা 6 ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং 500 পাউণ্ড ওজন হয়। এদের মাথায় ও ঘাড়ে প্রচুর লম্বা চুল থাকে। স্ত্রীরা 3 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং মাথায় ও ঘাড়ে চুল থাকে না। ওজন 300 পাউণ্ড পর্যন্ত।

এদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা ((migration) এবং সাংসারিক জীবনযাত্রা বড় বৈচিত্র্যময়। শীতকালে উত্তর মেরু অঞ্চলে দ্বীপসমূহে এদের খুব কমই দেখা যায়। তখন এরা হাজার হাজার মাইল দক্ষিণে নীল সমুদ্রে মৎস্য শিকারে ব্যস্ত। কিন্তু মে-মাসের গোড়ার দিকে এরা আবার উত্তর দ্বীপগুলিতে সাঁতরে ফিরে আসে এবং নিজ নিজ পুরানো আবাসস্থানগুলি খুঁজে নেয়।

প্রথমে বয়স্ক পুরুষেরা এসে উপস্থিত হয়। দু'তিন দিন ধরে তারা উপকূলে সাঁতার কাটে। চারদিক বেশ ভাল করে দেখে নেয় স্থানটা তাদের পক্ষে নিরাপদ কিনা। নিশ্চিন্ত হলে পর, তারা খুব সাবধানে ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং যেখানে সমুদ্রের ঢেউ উপকূল ভাগের খাড়া পর্বত গাত্রে আছড়ে পড়ে সেখানকার

পাথরের গা বেয়ে উঠতে থাকে।

পাহাড়ে উঠে এলে তাদের দৃষ্টি থাকে চতুর্দিকে। বাতাসের গন্ধ শোঁকে। নিথর করে দেয় দেহকে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে কান পেতে শুনতে থাকে বিপদ সংকেত। ঠিক যেন গুপ্তচর। তারা দেখতে আসে স্থানটিতে তাদের বসবাস, সন্তান পালনের অনুকূল পরিবেশ আছে কিনা।

সব কিছু বেশ করে বুঝে নিয়ে তারা আবার সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দেয়। পর্বত-সংকুল নির্জন উপত্যকা তখন পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে লোমশ শীলের এক বিরাট দল সমুদ্র থেকে হাজির হয় সেখানে। এরাও কিন্তু সবাই পুরুষ। তবে এদের মধ্যে থাকে কিছু প্রবীণ ও কিছু তরুণ। প্রবীণেরা তরুণদের পথ নির্দেশ দিয়ে সঙ্গে আনে বটে, তবে তটে উঠতে দেয় না। প্রবীণেরা কালো শিলার গা বেয়ে চুপিসারে পাহাড়ে উঠতে থাকে; আর তরুণেরা কাছাকাছি কোথাও একটু স্থান করে নিতে পারলে ডাঙ্গায় রাত্রিবাস করে একটু ঘুমিয়ে নেয়। ঊষার আবছা আলো ফুটে উঠার আগেই সাবধানী প্রবীণের দল আবার তাদের ঠেলে সমুদ্রে নামিয়ে দেয়। কি জানি কি হয় এই আশংকায়। কারণ ছ'বছর না হলে কোন তরুণ শীলের ঘাড়ের উপর প্রবীণেরা বিয়ের বোঝা চাপাতে চায় না। কিন্তু পরিণত বয়সে সংসারের খুঁটিনাটি সব যাতে শিখে নিতে পারে—তাই প্রবীণেরা তাদের সঙ্গে আনে।

অভিজ্ঞ সুলতানের 'হারেম' টি খুব ছোট হলে চলবে না। প্রতি পুরুষের জন্যে প্রায় 25 বর্গমিটার স্থান চাই—যেখানে সে পাহাড়ের গায়ে সংসার পাতবে। সংসারটি তো খুব ছোট নয়। এক একটি প্রবীণ শীলের 10 থেকে 15টি স্ত্রী থাকে। কখন কখন 50 থেকে 60টি। আর প্রত্যেক স্ত্রী এ সময়ে একটি করে সন্তান প্রসব করে।

স্বামীদের তখন অনেক কাজ। তবে তাদের প্রথম কাজ এটা দেখা যে, তার স্ত্রীদের কেউ যেন ছিনিয়ে না নেয়। দেখা গেছে যদি কোন পুরুষ অপরের একটি স্ত্রীকে দাঁত দিয়ে ধরে সকলের চোখের সামনে টানতে টানতে নিয়ে যায়, তাহলেও স্বামী বেচারা এই অপহরণের প্রতিবাদ করে না। কারণ, একটির জন্যে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করতে গিয়ে সেই ফাঁকে যদি সবগুলোই বেহাত হয়ে যায়। তাই একটির আশা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু এসব তো পরের কথা। এখন পর্যন্ত ডাঙ্গায় তো কোন স্ত্রী উঠে আসে নি। পুরুষেরা কেবল তাদের ভবিষ্যৎ 'হারেম' রচনা করার স্থান নিয়ে মারামারি করতেই ব্যস্ত! প্রতিটি প্রবীণ পুরুষ সাধারণতঃ আগেকার বছরের স্মৃতিঘেরা স্থানটি পেতেই ব্যস্ত থাকে। এমনও শোনা যায়, একটি লোমশ শীল তার পুরনো স্মৃতি দিয়ে ঘেরা খাড়া পর্বতগাত্রের হারেমটুকু পাবার

জন্যে একটানা দীর্ঘ 17 বছর সাঁতার কেটে আসতো। এটা চেনা গিয়েছিল এক দাগী প্রবীণকে দেখে—যে হাঙ্গরের আক্রমণে একটি কান হারিয়েছিল।

স্থান খোঁজার কলকোলাহল একসময় থিতিয়ে পড়ে। এবার নিজের নিজের হারেমে চুপচাপ শুয়ে থেকে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের আগমন আশায় অপেক্ষা করে। কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীদের গতি একটু ধীর। আসতে কয়েক দিন সময় লাগে। তবে স্বামীদেরও ধৈর্যের সীমা নেই।

জুনের মাঝামাঝি সময় স্ত্রীদল এসে পৌঁছয়। দলে দলে তারা পুরুষের মতই সাঁতার কাটে। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের পুরনো দিনের স্বামীদের খোঁজে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে। অনুরাগী দৃষ্টি মেলে খুঁজে ফেরে চারিদিকে। ডাক দেয় তীক্ষ্ন স্বরে। কান পেতে শোনে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—স্বামীরা প্রত্যুত্তরে এগিয়ে আসে কিনা! প্রায়ই সাড়া মেলে। আবার মাঝে মধ্যে পায়ও না। হয়তো তাদের স্বামী সমুদ্রঝঞ্ঝায় কোথাও ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন নিরুপায় বেচারী স্ত্রীরা অন্য স্বামীর সন্ধানে ফেরে এবং ডাক দেয় সেই সমস্ত তরুণদের যারা তটভূমে অপেক্ষা করে আছে। দ্বীপে ওঠার কয়েকদিনের মধ্যেই গর্ভবতী স্ত্রীরা সন্তানের জন্ম দেয়। সদ্যজাত সব সন্তানই নিশ্চয় এই নতুন সুলতানদের ঔরসজাত নয়। হতভাগ্য সুলতান তখন অপরের সন্তানবহনকারী স্ত্রীদের কটিদেশ বেষ্টন করে রাগে গরগর করতে থাকে। তার নিজের ঔরসজাত কিছু সন্তানও পরের বছর ঠিক সেই সময় খুব সম্ভবত অন্যের হারেমে জন্মগ্রহণ করে।

আগস্ট মাসে প্রবীন জনকের দল তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে একের পর এক সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুমারী তরুণী এবং গত বছরের জন্মানো পুরুষের দল। মাত্র কয়েকটি প্রবীণ অক্টোবর মাসেও দ্বীপে থেকে যায়।

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোমশ শীলের দল দ্রুতগতিতে দক্ষিণের প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ অঞ্চলের দিকে সাঁতার কাটতে থাকে। দীর্ঘ তাদের সমুদ্রযাত্রা। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চলে আসে তারা শীতের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া ছোট ছোট দ্বীপগুলি ফেলে—যেখানে তারা স্বল্পকাল স্থায়ী গ্রীষ্মে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের আত্মীয়বর্গ ও সমুদ্রসিংহ (sea-lions) দলও সঙ্গে থাকে।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে গ্রীনল্যাণ্ডের শীলেরা সুদূর উত্তরে আটলাণ্টিক মহাসাগরে চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের কিনারায় মাছ শিকার করতে থাকে। হেমন্তে তারা সাঁতরে দক্ষিণে আসে। ডিসেম্বরে তারা হাজারে হাজারে শ্বেতসমুদ্রের বরফের উপর দল বেঁধে বসবাস করে। ফেব্রুয়ারীতে বাচ্চা প্রসব করে। মে মাস পর্যন্ত তিনমাসকাল এই শিশুগুলি ঠাণ্ডা বরফের উপর চুপচাপ শুয়ে থাকে।

আবার মে মাসে বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের জনক-জননীর সঙ্গে উত্তরমেরুর দিকে সাঁতরে যায়।

গ্রীনল্যান্ড এবং ফ্রাজ জোসেফ (Fraz Joseph) দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী মেরু তুষার অঞ্চলে তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে—যারা আমেরিকায় শীত কাটিয়ে এল। গ্রীনল্যাণ্ডের শীলের দল যেভাবে তাদের শীত-বাসস্থানের অংশ ভাগ করে নেয় সেটা খুবই অদ্ভুত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শীত কাটায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপে; কেউ বা জান-মেয়ান (Jan-Mayen) দ্বীপে, যেটা হল গ্রীনল্যাণ্ড এবং নরওয়ের মাঝামাঝি। আবার কেউ বা শ্বেত সমুদ্রের প্রণালীতে বরফের উপর ভাসতে ভালবাসে। এই রকম উপনিবেশ ছাড়া শীতে অন্য কোথাও গ্রীনল্যাণ্ড শীলদের দেখা যায় না।

বহু এস্কিমোর জীবন এবং জীবিকা শীলদের উপর নির্ভরশীল। এস্কিমোরা ভাসমান বরফের উপর গর্ত করে অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করে। যদি কোন শীল শ্বাস নিতে সেই বরফের গর্তের ফাঁকে মাথা তোলে ওরা তাকে অস্ত্র দিয়ে গেঁথে ফেলে।

শীলের মাংস ব্যবহৃত হয় খাদ্য হিসাবে। চামড়া ব্যবহৃত হয় পোষাক এবং নৌকার ছাউনি হিসাবে। চর্বি ব্যবহৃত হয় জ্বালানী হিসাবে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে শীলের চামড়া দিয়ে তৈরী হয় দামী কোট।

শীলের বংশ যাতে লোপ না হয়, সেজন্যে যুক্তরাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনবছরের ঊর্ধ্বে কেবলমাত্র সংসারবিহীন তরুণ শীলদের শিকার করা চলবে এবং 40টি স্ত্রী-শীল পিছু একজন পুরুষ-শীল রেখে তবেই বাকিদের শিকার করতে হবে। এরপর তাদের চামড়া খুলে নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি করা যেতে পারে।

সমুদ্র-ঘোড়া

বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে 'সমুদ্র-ঘোড়া' (Sea-horse) অন্যতম। সমুদ্র-ঘোড়া মোটেই ঘোড়া জাতীয় নয়; এক রকমের সামুদ্রিক মাছ মাত্র। তবে মুখের আকৃতি ঘোড়ার মত বলে মাছটিকে সমুদ্র-ঘোড়া বলা হয়।

হাড় দিয়ে গঠিত অন্তঃকঙ্কাল বিশিষ্ট (bony fish) এই মাছটিকে প্রাণিবিদ্যায়, শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সিঙ্গনাথিফরমেস বর্গের (Order—Syngnathiformes) অন্তর্গত, হিপোক্যাম্পাস গণের (Genus—Hippocampus) মধ্যে ধরা হয়।

উষ্ণ মণ্ডলের সব সমুদ্রেই এদের দেখা যায়। সমুদ্রের অগভীর জলে বিভিন্ন গাছ গাছড়ার মধ্যে, ধারণকারী লেজটি (prehensile tail) দিয়ে কোন ডালপালাকে জড়িয়ে ধরে এরা এমনভাবে যাদুকরী খেলা দেখায়, যা দেখে মানুষ অবাক না হয়ে পারে না।

এদের দেহ বড় বিচিত্র। প্রকৃতির খেয়ালে এরা পেয়েছে ঘোড়ার মত মাথা ও খাড়া হয়ে চলার শক্তি। এদের ধড় থেকে মাথাটি ঘাড়ের কাছে প্রায় সমকোণে বাঁকানো; পেটটি ব্যাঙের মত ফোলা; আর ক্ষণে ক্ষণে গিরগিটির মত এদের রঙ বদলায়। আসল গায়ের রঙ ব্রোঞ্জের মত, অথবা খয়েরী, অথবা লালচে নয়তো নীল। পরিবেশের সঙ্গে এরা রঙ মিলিয়ে আত্মগোপন করতে পারে। কখনও কখনও দেহ থেকে বিচিত্র ধরনের কাঁটা বের হয়; ফলে এরা যখন স্থির থাকে তখন গাছপালা বলে মনে হয়। গাছপালার মধ্যে এমনভাবে মিলে থাকে যে, নড়াচড়া না করলে বোঝা মুস্কিল।

এ মাছের দেহে কোন আঁশ নেই। ত্বকের উপর হাড়ের মত শক্ত বস্তু দিয়ে তৈরী আংটির মত কঠিন প্লেট থাকে। মাথার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হয়ে নলের মত দেখায়। এই নলের প্রান্তভাগে আছে ছোট মুখ। মুখে কোন দাঁত নেই। নলের পিছনে দুপাশে দুটি চোখ। চোখের পিছনে আছে একখণ্ড হাড় দিয়ে সৃষ্ট কানকো। অন্য মাছের ক্ষেত্রে কানকো একাধিক হাড় দিয়ে সৃষ্ট। ফুলকা ছিদ্র খুবই ছোট। ফুলকাগুলি গোল এবং কানকোয় অবস্থিত। দেহে মাংসপেশী খুব কম। দেহের উপর হাড়ের প্লেটগুলিতে কাঁটা থাকে। ঘাড়ের কাছে ঐ কাঁটাগুলি সরু হয়ে কখনও বা ঘোড়ার মত কেশর সৃষ্টি করে; আবার কখনও মাথার উপর শিংয়ের মত দেখায়। মাথার কাছে দু-পাশে বক্ষ-পাখনা আছে; একটি কাঁটাযুক্ত পৃষ্ঠ-পাখনা আছে। কিন্তু সাধারণ মাছের মত শ্রোণী-পাখনা, পায়ু-পাখনা ও পুচ্ছ-পাখনা নেই। পায়ুছিদ্রের পর থেকে দেহটি ক্রমশঃ সরু হয়ে দীর্ঘ লেজের সৃষ্টি করে এবং লেজের উপর ভর করে

কোন বস্তুকে জড়িয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাঁতার কাটার সময় এরা খাড়া হয়ে সাঁতার কাটে। দেহের উপর শক্ত আংটির মত প্লেট থাকার জন্যে দেহটিকে যেদিকে খুশী বাঁকানো যায় না। পৃষ্ঠপাখনার দ্রুত সঞ্চালনের ফলে সম্মুখে-পিছনে এবং উপরে-নীচে সাঁতার কাটে। ঘাড়ের কাছে কেশরের মত পাতলা বক্ষ-পাখনাদুটি সবসময় সঞ্চালিত

চিত্র নং ৪

হয়ে সাঁতার কাটার সময় গতি নির্ধারণে সাহায্য করে। দেহ অভ্যন্তরস্থ বায়ু-পূর্ণ পটকাটি (air bladder) দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং খাড়া হয়ে থাকতে সাহায্য করে। পটকার মধ্যে থেকে যদি এতটুকু বাতাস কোন রকমে ছিদ্র হয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে এদের দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মাছটি অসহায়ভাবে সমুদ্রতলে তলিয়ে যায়। পটকা মধ্যস্থ রক্তজালিকার মাধ্যমে যদি পুনরায় গ্যাস সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আবার উঠে দাঁড়ায়। এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

সামুদ্রিক ঘোড়ার সবচেয়ে বৈচিত্র্য হল এদের পুরুষ মাছের পায়ুর পিছনে থাকে ক্যাঙ্গারুর মত মস্ত এক থলি ; যার মধ্যে শিশুমাছেরা লালিত হয়। পেটের নীচে দু-পাশ থেকে ত্বকের অংশবিশেষ মুড়ে এসে এমনভাবে মিলিত হয় যাতে থলির সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে প্রায় 50 প্রজাতির সমুদ্র-ঘোড়া দেখা যায়। সবচেয়ে ছোট আকৃতির সমুদ্র-ঘোড়া এক ইঞ্চির মত দীর্ঘ আর সব চেয়ে বড়টি হল দু'ফুটের মত। বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে তিন রকম প্রজাতির সমুদ্র-ঘোড়া সচরাচর দেখা যায়। এদের নাম হল—

(1) হিপ্পোক্যাম্পাস ট্রাইমাকুলেটাস (H. trimaculatus)
(2) হিপ্পোক্যাম্পাস গুটুলেটাস (H. guttulatus)
(3) হিপ্পোক্যাম্পাস হিস্ট্রিক্স (H. hystrix)

এই তিন প্রজাতির মধ্যে তফাৎ হল পৃষ্ঠ-পাখনায় কাঁটার সংখ্যা ও দেহের হাড়ের প্লেটের সংখ্যা।

সমুদ্র-ঘোড়াদের মধ্যে পুরুষের পেটে থলি থাকায় স্ত্রী-পুরুষ সহজেই চেনা যায়। এদের মিলনের আগে যে পূর্বরাগ অনুষ্ঠিত হয় তা বড় মজার ব্যাপার। স্ত্রী-মাছের আবেগে যদি পুরুষ-মাছ সাড়া দেয় তবে 24 থেকে 48 ঘণ্টা স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে এবং সাঁতার কাটে। এই সময় স্ত্রী-মাছ একটু উপরে এবং পুরুষ-মাছ একটু নীচে এমনভাবে অবস্থান করে যাতে ডিমগুলি স্থানান্তরের সুবিধা হয়। তারপর এক সময় তারা পরস্পর মিলিত হয়। এই সময় স্ত্রী-মাছ একে একে তার দেহ থেকে লালচে ডিমগুলি পুরুষের থলিতে স্থানান্তরিত করতে থাকে। স্থানান্তরের সময় ডিমগুলি শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত (fertilised) হয়। স্ত্রী-মাছ কখন একটু কাছে আসে আবার একটু দূরে সরে যায়। এইভাবে দু-তিন দিনে 250 থেকে 300টি ডিম পুরুষের পেটের থলিতে স্থানান্তরিত করে। তারপর স্ত্রী-মাছ মুক্ত বিহঙ্গের মত সরে পড়ে। বাচ্চাদের লালন পালনের সব দায়িত্ব একাকী পুরুষের। স্ত্রী-মাছের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

প্রায় 45 দিন বহু কষ্ট করে পুরুষ-মাছ ডিমগুলি তার পেটের থলির মধ্যে বয়ে বেড়ায়। এই থলিতে ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয় তখন বাচ্চাগুলি খুবই ছোট এবং গায়ের রঙ একেবারে স্বচ্ছ। লেন্স দিয়ে দেখলে হৃৎপিণ্ডের কম্পন পর্যন্ত দেখা যায়। 45 দিন পরে বাচ্চাগুলি থলি থেকে বেরিয়ে আসে। কখনও কখনও একটি গোল বলের মত সমস্ত বাচ্চার স্তূপটি একসঙ্গে বেরিয়ে আসে। তারপর বাচ্চাগুলি যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। প্রকৃতিতে এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল যেখানে একা পুরুষকেই সন্তান লালনের সব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মানুষের কাছে স্মরণাতীত কাল থেকে সমুদ্র-ঘোড়া পরিচিত। মদে ভেজানো সমুদ্র-ঘোড়াকে অত্যন্ত বিষাক্ত বলে ধরা হয়। মধুর সঙ্গে ভিনিগারে মেশানো সমুদ্র-ঘোড়ার ভস্মকে অন্য বিষের প্রতিষেধক হিসাবে ধরা হয় এবং চর্মরোগ, টাক পড়া ও পাগলা কুকুরে কামড়ানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে ওষুধ হিসাবে অতীতে ব্যবহার করা হত। গোলাপের তেলের সঙ্গে সমুদ্র-ঘোড়ার ভস্ম শৈত্য ও জ্বরের ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত করা হত। আজও চৈনিক ভেষজ শিল্পে সমুদ্র-ঘোড়ার গুঁড়া নানা ওষুধে ব্যবহৃত হয়। এ-জাতীয় ঘোড়া-মুখো মাছ বাংলার মিষ্টি জলেও কখনো কখনো দেখা যায়।

সমুদ্রকন্যা

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলিতে ছড়িয়ে আছে 'সমুদ্রকন্যা'র গল্প। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্যে সমুদ্রকন্যাকে নিয়ে রচিত হয়েছে নানা রূপকথা—যা আজও সুখপাঠ্য। সমুদ্রকন্যাকে কোথাও বলা হয় 'মৎস্যকন্যা'—কোথাও বা বলা হয় পাতালপুরীর রাজকন্যা। আদর্শ সমুদ্র কন্যার মাথা এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ স্ত্রীলোকের মত এবং কোমরের নীচের অংশ মাছের মত। বিভিন্ন উপকথায় উল্লিখিত আছে এরা নাকি মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম। মানুষের সঙ্গে ভালবাসা পাতিয়ে আদর্শ স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে চলে যায়—কিন্তু আবার ঘর-সংসারে ফিরে আসে। এদের স্নেহ, মায়া, মমতা অপরিসীম। এদের নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গল্প ও কবিতা।

আসলে সমুদ্রকন্যা হল এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী—যার মাথা এবং ঊর্ধ্বাংশ কিছুটা মানুষের মতই—কিন্তু নিম্নাংশ মাছের মত। এদের ইংরাজীতে বলা হয় Sea-cow বা সমুদ্রগাভী। তিমি, ডলফিন, সমুদ্রসিংহের মত সমুদ্রগাভীও এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা অত্যন্ত নিরীহ বলে শিকারীর কাছে খুবই সহজলভ্য। দীর্ঘদিন ধরে নির্বিচারে শিকারের ফলে এরা আজ অবলুপ্তির পথে।

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে বিজ্ঞানীদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে এইসব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আদি বংশধর স্থলচর। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে এদের পূর্বপুরুষেরা স্থলচর থেকে হল উভচর। পরে এরা পুরোপুরি হল জলচর। আবার সব সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বংশধর কিন্তু এক নয়। সমুদ্রসিংহ, সীল প্রভৃতিদের পূর্বপুরুষ ছিল মাংসাশী-প্রাণী। বর্তমানে এরা উপবর্গ পিনিপিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত (Sub-order—Pinnipedia)। তিমিদের পূর্বপুরুষ ছিল বহু প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী। বর্তমানে এরা সিটেসিয়া বর্গের (Order—Cetacea) অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রগাভীদের পূর্বপুরুষ ছিল উদ্ভিদভোজী। বর্তমানে এরা সাইরেনিয়া বর্গের (Order—Sirenia) অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক রোমার ও সিম্পসনের মতে (Romar & Simpson) আফ্রিকার বর্তমান স্থলচর প্রাণী হাইর‍্যাক্স (Hyrax), হাতী এবং সমুদ্রগাভীর পূর্বপুরুষ ছিল এক। সেই পূর্বপুরুষদের কোন এক শাখা খাদ্যের অন্বেষণে

জলাশয়ে চড়ে বেড়াতো। হাজার হাজার বছর ধরে জলীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে দেহের পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বর্তমান সমুদ্রগাভীর উৎপত্তি।

ভারতীয় সমুদ্রগাভীর বৈজ্ঞানিক নাম হল ডুগং (Dugong dugon)। ভারতের কচ্ছ প্রণালী, মালাবার উপকূলে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে এবং সিংহলের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে একদিন এদের প্রচুর দেখা যেত। বর্তমানে খুব কমই দেখা যায়। লোহিত সাগর এবং অস্ট্রেলিয়া ও ফরমোজা উপকূল থেকে যে সব প্রজাতির সমুদ্রগাভী পাওয়া যায় তাদের বৈজ্ঞানিক নাম হেলিকোর (Helicore)। কিন্তু বর্তমানে এদের Dugong গণের (genus) মধ্যেই ধরা হয়।

ডুগং-এর দৈর্ঘ্য 10 থেকে 12 ফুট ; দেহের ঘের 6 থেকে 8 ফুটের মত। ওজন প্রায় এক টনের মত। স্ত্রী-ডুগং পুরুষদের চেয়ে ছোট। ডুগং-এর দৈহিক আকৃতি মোটামুটি বড় সীলের মত অথবা ছোট তিমির মত। পেটের তলা চ্যাপ্টা ; কিন্তু পিছন দিক ও পার্শ্ব দিক গোলাকৃতি, ঘাড় নেই। মাথাটি সরাসরি ধড়ের উপর অবস্থিত। ধড় ও মাথার মাঝে একটু খাঁজ থাকে। মাছের মত লেজটি দেহের অক্ষের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে (horizontal) অবস্থিত এবং পুরু ত্বক দিয়ে তৈরী। ঊর্ধ্ববাহু সাঁতার কাটার জন্য চওড়া 'প্যাডেল' (paddle)-রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। নিম্নপদ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। স্ত্রী-ডুগংদের বাহুর নীচে আছে বাচ্চাদের দুগ্ধপানের জন্য স্তনযুগল। দেহের তুলনায় মুখ ছোট। উপরের ঠোঁট নীচের ঠোঁটের চেয়ে অনেক বড়। ঐ ঠোঁট কিছুটা নীচের দিকে ঝুলে থাকে এবং হাতীর শুঁড়ের মত দেখায়। সমস্ত দেহের উপর এমন কি 'প্যাডেল' এবং লেজের উপরেও ছোট ছোট লোম থাকে। তবে মুখপ্রান্ত ও নীচের চোয়ালের লোম একটু লম্বা। চোয়ালের দুই প্রান্তে ভোঁতা কাঁটার মত বস্তু দেখা যায়। বাচ্চা সমুদ্রগাভীর ঊর্ধ্বচোয়ালে 4টি এবং নিম্ন চোয়ালে 8টি করে কৃন্তক দাঁত (incisor) থাকে এবং পেষক দাঁত (molar) থাকে 5টি করে। পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হলে ঊর্ধ্ব চোয়ালে 3টি এবং নিম্ন চোয়ালের একদিকে 2টি করে কৃন্তক দাঁত থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে সামনের কৃন্তক দাঁতগুলি হাতীর 'গজদন্তে'র মত ঊর্ধ্ব ঠোঁট ভেদ করে সামনে বেরিয়ে আসে। স্ত্রী-ডুগং-এর ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় না। নাসারন্ধ্র দুটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি হয়ে মাথার উপর অবস্থান করে, যাতে মাথা জলের উপর তুললেই শ্বাসক্রিয়ার জন্য সহজে বাতাস নিতে পারে। এদের শ্বাস-অঙ্গ আজও ফুসফুস। এদের চোখ ছোট এবং দুপাশে দুটি গর্তের মধ্যে অবস্থিত। বহিঃকর্ণ থাকে না তবে দুপাশে দুটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি কর্ণ-ছিদ্র দেখা যায়। গায়ের রং ধূসর অথবা পিঙ্গল বর্ণের। তবে পেটের তলা মাংসের মত লাল।

জন্তুটি চালচলনে অত্যন্ত ধীরস্থির, দ্রুত পলায়নে অক্ষম। প্রায়ই সমুদ্রের অগভীরে উদ্ভিদের জন্য চড়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে শির দাঁড়ার উপর ভর করে ঊর্ধ্বাংগ জলের উপর তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তখন লাল অথবা পিঙ্গল বর্ণের পেটের তলায় রৌদ্রের ঝলকানিতে কালো মাথাসহ দূর থেকে রূপসী সমুদ্রকন্যা বলেই ভ্রম হয়। জাহাজের নাবিকদের এ দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। তীরে এসে তারা এদের সম্বন্ধে নানা গল্প ছড়ায়। সেই গল্প থেকেই বিশ্ব-সাহিত্যে সমুদ্রকন্যাদের নিয়ে রূপকথার সৃষ্টি হয়।

এরা একসঙ্গে একটি করেই বাচ্চা পাড়ে। বাচ্চাকে অত্যন্ত স্নেহভরে স্তন পান করিয়ে লালন করে। কখনও কখনও স্ত্রী সমুদ্রগাভী বাচ্চাকে ঊর্ধ্ববাহু বা 'প্যাডেল' দিয়ে জড়িয়ে ধরে, লেজের উপর ভর করে জলের উপর ঊর্ধ্বাংশ তুলে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। লোহিত সাগরে এরকম দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে।

জেলেদের জালে ধরা পড়লে এদের চক্ষুগ্রন্থি থেকে জলধারা নির্গত হতে দেখা যায়। হয়তো আসন্ন মৃত্যুর জন্য এই জলধারার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবার

চিত্র নং 9

আকুতি জানায়। কিন্তু মালয়ে অধিবাসীরা মনে করেন এই জলধারা ভালবাসার প্রতীক। সন্তানকে আদর করার সময় অথবা স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময়েও নাকি এই জলধারা দেখা যায়। এরা প্রায় 70-80 বছর বেঁচে থাকে।

ভারতে মানা প্রণালীতে এদের এক সময় প্রচুর দেখা যেত। কিন্তু এরা দ্রুত পলায়নে অক্ষম হওয়ায় এবং এদের মাংস স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রিয় খাদ্যরূপে বিবেচিত হওয়ায়, স্থানীয় জেলেরা বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে এদের শিকার করে। ফলে এরা মানা প্রণালীতে আজ প্রায় অবলুপ্ত। কালেভদ্রে দেখা যায়। এদের চর্বি থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাও মানুষের কাছে লোভনীয়। একটি পূর্ণবয়স্ক ডুগং থেকে 10 থেকে 12 গ্যালন তেল পাওয়া যায়। এই তেল জ্বালানী, সাবান কারখানায় নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাইরেনিয়া বর্গের (Sirenia) প্রধান গণ দুটি—যথা ম্যনাটি (Manatee) এবং ডুগং (Dugong)। দুটি গণের মধ্যে মূল তফাৎ হল ম্যানাটির পেষক দাঁতের উপর এনামেলের আবরণ আছে এবং এই দাঁতের সংখ্যা ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালের একদিকে 20টি করে। সব দাঁত একসঙ্গে ব্যবহার হয় না। এদের ঘাড়ে 6টি কশেরুকা আছে এবং 'প্যাডেলে'র আঙ্গুলে নখ আছে। অপর দিকে ডুগং-এর 5 থেকে 6টির বেশী পেষক দাঁত থাকে না। এদের ঘাড়ে 7টি কশেরুকা আছে এবং আঙ্গুলে নখ নেই। তাছাড়া ম্যানাটির লেজটি মোটামুটি গোলাকৃতি ; কিন্তু ডুগং-এর লেজের মাঝে খাঁজ আছে।

'ম্যানাটি' সাধারণতঃ উত্তর আমেরিকার নদীগুলিতে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নদীগুলিতে এবং আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়। এরা 7 থেকে 13 ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এরাও অগভীর জলে থাকতে ভালবাসে। যখন নদী অথবা সমুদ্রের তলে চড়ে বেড়ায় তখন হাত বা 'প্যাডেল' দুটি জলজ উদ্ভিদগুলিকে মুখের কাছে টেনে আনার কাজে ব্যবহার করে। গভীর জলে এরা মাথাটি নত করে ধনুকের মত বেঁকে খাড়া হয়ে থাকে। যখন বিশ্রাম নেয় তখন জলের তলায় উবুড় হয়ে শুয়ে থাকে। কখনও কখনও নাকি এরা অল্পক্ষণের জন্য প্যাডেলের সাহায্যে তীরে উঠে আসে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বেরিং উপকূলে রাইটিনা (Rhytina) নামক এক ধরনের সমুদ্রগাভী দেখা যেত। এরা 25 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতো। অতি সাম্প্রতিককালে এরা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের লোভ থেকে আজ ভারতীয় ডুগং-কেও বাঁচানো দরকার। নতুবা এরাও আমাদের জীবদ্দশাতেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

মাছেদের ভালোবাসা ও বাৎসল্য

বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "মাছের মায়ের আবার কান্না ?" প্রবাদটা সাধারণতঃ নিষ্করুণ কান্না অথবা লোকদেখানো কান্নার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মানুষের ধারণা মাছেদের বোধ হয় দুঃখবেদনা অথবা ভালবাসার কোন অনুভূতি নেই। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। সমস্ত জীবের মধ্যেই কিছু না কিছু দুঃখবেদনা, ভালোবাসা ও আনন্দের অনুভূতি আছে। তবে তার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নরূপ। কোন কোন মাছ হয়তো তাদের সন্তানসন্ততিকে চেনেই না। কেবলমাত্র জন্ম দিয়েই জৈবিক জীবনের সার্থকতা শেষ করে। আবার অন্য দিকে এমন মাছও আছে যারা রীতিমতো সন্তানসন্ততি ও নিজের সঙ্গিনীর প্রতি দারুণ ভালোবাসা দেখায়।

শ্যামদেশীয় বেট্টা স্পেলন্ডেনস্ (Betta splendens) একটি অনুরূপ মাছ যাকে সাধারণতঃ অনেক বাড়ীতে অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে দেখা যায়। মাছগুলির বিশেষ এক বর্ণবৈচিত্র্য আছে। বিশেষ করে পুরুষ মাছগুলির। প্রজনন ঋতুতে যদি অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে পুরুষ-মাছটিকে স্ত্রী-মাছ থেকে পৃথক করে একটি কাচের দেওয়ালে লাগান যায়, ঐ কাঁচের মধ্য দিয়ে যখন পুরুষ-মাছটি স্ত্রী-মাছটিকে দেখতে পায়, তখন মিলনের জন্য তার মধ্যে এক নিবিড় আকুলতার প্রকাশ পায়। কাঁচের জন্য যতই সে মিলনে বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং গায়ের রং অধিকতর রঙ্গীন হতে থাকে। পাগলের মতো কাঁচের উপর ধাক্কা মারতে থাকে। এরপর কয়েক-দিন পরে যখন তার উত্তেজনা কিছুটা কমে আসে তখন সে মুখ হতে নির্গত লালা দিয়ে একটি সুন্দর বাসা তৈরী করে। এই বাসা শিল্পকলার এক অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মুখের মধ্যে বাতাস নিয়ে জল ও লালার সাথে মিশিয়ে দেড় ইঞ্চি পরিমিত একটি ভাসমান বুদ্বুদের বাসা তৈরী করে। এরপর যদি কাচের দেওয়ালটি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পুরুষ-মাছটি তখনি স্ত্রী-মাছটির দিকে ছুটে চলে যায় এবং পাখনার সাহায্যে নাচতে নাচতে বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে স্ত্রী-মাছটিকে বাসার দিকে তাড়া করে আনে।

স্ত্রী-মাছটি বাসার কাছে এসে ডিম পাড়তে শুরু করে। পুরুষ-মাছটি নিজের দেহ দিয়ে স্ত্রী-মাছটিকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিতে থাকে যাতে সমস্ত ডিমগুলি স্ত্রী-মাছের দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। পুরুষ-মাছটি তখন স্ত্রী-মাছটিকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ডিমগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে ভাসমান বাসাটিতে

এনে জড় করে। তারপর আবার স্ত্রী মাছটিকে তাড়িয়ে এনে তার পেটের উপর চাপ দিয়ে ডিমগুলি বার করতে থাকে। এই নিয়ম কয়েকদিন ধরে চলে। অবশেষে স্ত্রী-মাছের দেহ হতে সমস্ত ডিমগুলি বেরিয়ে এলে পুরুষ-মাছটি স্ত্রী-মাছটিকে তাড়িয়ে দেয়। যদি সে যেতে না চায় তা হ'লে তাকে হত্যা করে। বুদ্‌বুদের মতো ঐ ভাসমান বাসাটিতে বাচ্চাগুলি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং যতদিন না নিজেরা স্বাধীনভাবে যেতে শেখে ততদিন পুরুষ-মাছটি সব সময় বাসাটিকে ও বাচ্চাগুলিকে আগলে রাখে।

আর এক ধরনের মাছ আছে, প্রাণিবিজ্ঞানে যাদের কিক্‌লিড্‌ (Cichlied) মাছ বলা হয়। এদের ক্ষেত্রে মাছগুলি প্রাপ্তবয়স্ক হলে পুরুষ-মাছ তার ভাবীকালের সন্তানসন্ততির মা হবার জন্য একটি স্ত্রী-মাছকে সঙ্গিনী নির্বাচন করে। এই নির্বাচন যদিও পুরুষ-মাছের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে তথাপি স্ত্রী-মাছ পুরুষের আধিপত্য মেনে না নিলে যুদ্ধ অনিবার্য এবং স্ত্রী-মাছ সঙ্গিণী হতে রাজী না হলে পুরুষ-মাছটি স্ত্রী-মাছটিকে মেরে ফেলে। যদি যুদ্ধের সময় স্ত্রী-মাছটি রাজী হয় তা হলে সন্ধি হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো নিদারুণ সখ্য গড়ে উঠে।

এরপর দুইজনের মিলনের পূর্বে জলাশয়ের মধ্যে পুরুষ-মাছটি একটি গর্ত তৈরী করে, তারপর একটি পরিষ্কার প্রস্তরখণ্ড পুরুষ মাছটি মুখে করে ঐ স্থানে টেনে আনে, যার উপরে স্ত্রীমাছটি ডিম পাড়ে। যতক্ষণ না ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দুটি মাছ পালা করে সব সময় ডিমগুলিকে রক্ষা করে চলে। বাচ্চা ফুটে বের হলেই অনতিদূরে তারা আবার একটি গর্ত করে। একটি মাছ ঐ নতুন গর্তটিকে পাহারা দেয় এবং অন্য মাছটি বাচ্চা-গুলিকে মুখে করে বয়ে আনে। এমনি ভাবে তারা কয়েকবারই বাচ্চাগুলিকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়। স্থানান্তরের অর্থ হল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা এবং নূতন স্থানে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা। এই ধরনের মাছকেও অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে রাখা যায়।

অপর একটি মজাদার মাছ হল স্পিনাকিয়া (Spinachia)। প্রজনন ঋতুতে এই জাতীয় মাছের পুরুষদের পেটের তলা হয় গাঢ় লাল। পিঠের দিক সবুজ এবং দুই পাশ রুপোর মতো সাদা। মে, জুন মাসে পুরুষ-মাছ-গুলি সমুদ্রের তলায় ছোট ছোট সামুদ্রিক আগাছা কুড়িয়ে এনে মুখের লালার সাহায্যে একটি সুন্দর মাকড়সার জালের মতো বাসা তৈরী করে। তারপর পুরুষ-মাছটি নাচতে নাচতে তার রঙের বাহার দেখিয়ে একটি স্ত্রী-মাছকে আকৃষ্ট করে এবং বাসার দিকে টেনে আনে। এখানে কোন জোরজবরদস্তির বালাই নেই। যদি স্ত্রী-মাছটি রাজী না হয় তবে পুরুষটি অন্য সঙ্গিনীর সন্ধানে বাহির হয়। স্ত্রী-মাছটি এসে দু' একদিনের মধ্যেই বাসার মধ্যে ডিম পাড়ে।

তারপর চলে যায়। পুরুষ-মাছটি সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাসাটির পাহারা দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সব-শেষে বলছি আর একটি মাছের কথা যার নাম হেপ্লোক্রোমিস মাল্টি-কালার (Haplo Chromis-muiticolar)। মাছটি পাওয়া যায় মিশর দেশে। প্রজনন ঋতুতে এই জাতের পুরুষ-মাছ লেজের সাহায্যে জলের মধ্যে বালি কেটে একটি গর্ত তৈরী করে। এরপর একটি সঙ্গিনী খুঁজে এনে তাকে গর্তের মধ্যে ডিম পাড়তে বাধ্য করে। ডিম পাড়া শেষ হলেই এক্ষেত্রে স্ত্রী-মাছটি ডিমগুলিকে মুখের মধ্যে পুরে নেয়। সমস্ত ডিমগুলি মুখভর্তি করে কুড়িয়ে নিয়ে স্ত্রী-মাছটি যখন ছুটে পালায় তখন পুরুষ-মাছটি স্ত্রীমাছটির এ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তার পিছু পিছু দৌড়াতে থাকে। অনেক সময় স্ত্রী মাছটিকে মেরেও ফেলে। মৃত্যুর পর দেখা যায় তখনও স্ত্রী-মাছটির মুখে সমস্ত ডিমগুলি লুকানো আছে। একটি ডিমকেও সে নষ্ট করতে চায়না তাই সে পুরুষ-মাছটিকে বাধা দেওয়ার জন্য কখনও মুখ খোলেনা।

যদি সে পুরুষের হাতে রক্ষা পায় তবে যতদিন না বাচ্চাগুলি মুখের মধ্যে বড় হয়,—তত দিন নিজে না খেয়ে বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে ঘোরে। একটু বড় হলে বাচ্চাগুলিকে নিজের পাশে ছেড়ে দেয়। বাচ্চাগুলি চরে ফিরে খায়। কিন্তু কোন শত্রু এসে পড়লে স্নেহশীলা মা মুখটি আবার হাঁ করে এবং বাচ্চা-গুলি দ্রুত মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। এমনি করে দীর্ঘদিন ধরে মা তার সন্তানদের লালন পালন করে। অনেক সময় মুখটি বন্ধ থাকায় নিজে না খেতে পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। তবুও কখনও একটি সন্তানকে সে নিজে খেয়ে ফেলে না।

আমাদের দেশেও এমনি অনেক মাছ আছে যেমন শোল মাছ, ল্যাটা মাছ ইত্যাদি যারা নিজেদের সঙ্গী খুঁজে নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। প্রজনন ঋতুতে পুকুরের তলায় কিছুটা মাটিকে পরিষ্কার করে নিয়ে ডিম পাড়ে এবং যতদিন না বাচ্চারা স্বাবলম্বী হয় ততদিন পর্যন্ত মা বাবা উভয়েই যৌথ দায়িত্ব পালন করে বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

সন্তানদের প্রতি স্নেহ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সব জন্তুদের মধ্যেই কোন না কোন উপায়ে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের উপায় দেখা যায় সুতরাং মাছের মায়েরও কান্না আছে, বেদনা আছে, স্নেহ ও ভালবাসা আছে। বিজ্ঞানীর চোখে "মাছের মায়ের আবার কান্না"—প্রবাদটী অচল।

কীটপতঙ্গের সমাজ

উইপোকা, পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি হল সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণী-ভুক্ত প্রাণী। অধিকাংশ কীটপতঙ্গ এককভাবে বাস করলেও কয়েকরকম কীটপতঙ্গের মধ্যে বিচিত্র ধরনের সমাজবদ্ধ জীবন দেখা যায়। সামাজিক পতঙ্গেরা বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ তৈরী করে বাস করে। একটি উপনিবেশ সামাজিক রীতি অনুযায়ী একই প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে কাজ অনুসারে শ্রেণীভেদ থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর কীটপতঙ্গরা তাদের নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী বা উপনিবেশকে বাঁচিয়ে রাখে।

উইপোকা

উইপোকা সাধারণতঃ শ্বেত পিঁপড়ে নামে পরিচিত এবং সামাজিক পতঙ্গ হিসাবে এরা পিঁপড়ের মতই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরা সাধারণতঃ পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডল এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বাস করে; যেখানে বৃষ্টিপাত একটু বেশী। ঠাণ্ডা আবহাওয়া মোটেই সহ্য করতে পারে না। পিঁপড়ের পরেই প্রজাতি সংখ্যার দিক থেকে এরা দ্বিতীয় এবং এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় 1700 রকমের উইপোকা প্রজাতির কথা জানা গেছে। এরা আলো সহ্য করতে পারে না। তাই এরা কাঠের গুঁড়িতে বা মাটির নীচে অন্ধকারে বাসা বাঁধে। মাটির তলায় এরা নানা ধরনের পরস্পর সংযুক্ত সুড়ঙ্গ বা প্রকোষ্ঠ তৈরী করে যেগুলি হলো এদের বাসা। বিভিন্ন প্রজাতির বাসার ধরন একটু পৃথক। অনেক সময় মাটির উপরেও বাসা হিসাবে "উইঢিবি" তৈরী করে। মাটির ওপরে অথবা নীচে উইপোকার বাসাগুলিকে "উইঘর" বা Termitarium বলে। বিভিন্ন ধরনের অলিগলিযুক্ত এই বাসাগুলি মাটির নীচে কয়েকফুট থেকে 30 ফুট পর্যন্ত গভীরে অবস্থান করতে পারে। আবার মাটির উপরের শক্ত উইঢিবিগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের মত উঁচু হতে পারে। আফ্রিকার কঙ্গো উপজাতিরা এই সব ঢিবিগুলিকে পরিষ্কার করে ভিতরে বসবাস করে। শ্রমিক উইপোকা যখন এই সুড়ঙ্গগুলি তৈরী করে তখন মুখ দিয়ে মাটি সরিয়ে বালির সঙ্গে লালা ও মল মিশিয়ে এক ধরনের প্লাষ্টারের মত বস্তু তৈরী করে যা দিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরটি প্রলেপ দেয়। ঐ বস্তু শুকিয়ে গেলে সিমেন্টের মত শক্ত ও মসৃণ হয়। এই ধরনের ভূনিম্নস্থ বাসা শ্রমিক উইপোকার এক আশ্চর্য-জনক কারুকার্য খচিত শিল্পকর্ম। সব সুড়ঙ্গ পথ মিলিত হয় একটি বড়

ধরনের প্রকোষ্ঠে যেটিকে বলা যায় 'রাজবাড়ী'। এর মধ্যেই অবস্থান করে রাণী উই ও কয়েকটি পুরুষ উইপোকা।

ভূনিম্নস্থ বাসার মধ্যে উইপোকারা এক বিরাট উপনিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক জীবন যাপন করে। একই প্রজাতি উইপোকার মধ্যে শারীরিক গঠন ও কাজের প্রকারভেদ অনুযায়ী উপনিবেশের সদস্যরা পিঁপড়ের মতই নানা শ্রেণী বা জাতিতে বিভক্ত।

উই সমাজের শ্রেণীভেদ (Caste) :—প্রজনন-কার্যে সক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকার সমাজের মধ্যে পরিণত যৌনতাপ্রাপ্ত তিন ধরনের স্ত্রীপুরুষ দেখা যায়।

(ক) প্রজনন কার্যে সক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণী (Fertile, reproductive or sexual castes) :—

1) **পূর্ণ ডানাযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণী** (True Kings and Queens :) —এই ধরনের পরিণত যৌনতাপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক ডানা থাকে এবং এরা একটি উপনিবেশের প্রাথমিক স্ত্রী-পুরুষ বলে গণ্য হয়। দেহবর্ণ হলদে অথবা পিঙ্গল বর্ণের বা কালো। সাধারণতঃ দুজোড়া পাত্‌লা ডানা থাকে। ডানা দেহ অপেক্ষা দীর্ঘ। পুঞ্জাক্ষী বড় বড়। প্রজনন কার্যে সক্ষম এই সব স্ত্রী-পুরুষ একটি উপনিবেশে রাজারাণীর মত জীবন যাপন করে। এরা বিশেষ ধরনের নির্মিত বড় বড় প্রকোষ্ঠে বাস করে। এদের পরিচর্যা কার্যে নিযুক্ত থাকে শত শত শ্রমিক উইপোকা। যৌন মিলনের আগে এদের ডানা খসে যায়। যৌন মিলনের পর স্ত্রী উইপোকার যৌনাঙ্গ-সমূহ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে দেহ মোটা ও 10 সেঃ মিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এরা 15 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। উপনিবেশের মধ্যে রাণীর একমাত্র কাজ ডিম পাড়া এবং পুরুষের কাজ নিষিক্তকরণ। এককথায় স্ত্রী-পুরুষের কাজ কেবল প্রজনন।

2) **ক্ষুদ্র ডানাযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ শ্রেণী** (Substitute King and Queens) :—এগুলিকে পরিপূরক স্ত্রী-পুরুষ বলা হয়। যখন কোন উপনিবেশে ডানাযুক্ত প্রাথমিক স্ত্রী-পুরুষ কোন কারণে লুপ্ত হয়ে যায় তখন এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদের দুজোড়া ছোট অথবা লুপ্ত ডানা থাকে, যা ওড়ার জন্য ব্যবহার হয় না। দেহ হালকা বর্ণের। পুঞ্জাক্ষি খুব ছোট ছোট। যৌনাঙ্গসমূহ প্রাথমিক স্ত্রী-পুরুষের মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত নয়। এরা আকারেও ছোট হয়।

3) **ডানাবিহীন স্ত্রী-পুরুষ শ্রেণী** (Ergatoid Kings & Qneens):—এগুলি শ্রমিকের মত ছোট ছোট পরিপূরক স্ত্রী ও পুরুষ। এ ধরনের স্ত্রী-পুরুষ কিছু প্রাচীনতম প্রজাতির উপনিবেশে দেখা যায়। এদের কোন ডানার

চিহ্ন থাকে না। দেহ বর্ণহীন। পুঞ্জাক্ষি লুপ্ত। যৌনাঙ্গসমূহ উন্নত মানের নয়।

(খ) **প্রজনন কার্যে অক্ষম বন্ধ্যা শ্রেণীসমূহ** (Sterile or Aborted castes) ঃ এগুলি ডানাবিহীন উইপোকা। এরা প্রজনন কাজে অক্ষম। এদের মধ্যে যৌনাঙ্গ সুপ্ত থাকে। এরা আবার কয়েক রকমের হয়।

(1) **শ্রমিক শ্রেণী** (Workers) ঃ একটি উইপোকার উপনিবেশের মধ্যে এদের সংখ্যাধিক্যই বেশী। হাজার হাজার শ্রমিক উপনিবেশের নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। এরা বংশ বিস্তার করতে পারে না। এদের দেহ ছোট, বর্ণহীন এবং পুঞ্জাক্ষি থাকে না। এদের চোয়াল অত্যন্ত দৃঢ়। কাজ অনুসারে শ্রমিক উইপোকা দুই থেকে তিন ধরনের হয়।

কিছু শ্রমিকের কাজ রাণী ও পুরুষের সেবাযত্ন করা। কিছু শ্রমিক রাণীর বাসা থেকে ডিমগুলিকে স্থানান্তরিত করে বাচ্চা লালনপালনে ব্যস্ত থাকে, আবার কারো কাজ হল উপনিবেশের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা। কোন কোন প্রজাতির উইপোকা ছত্রাকভূক হওয়ায় সেই সকল উপনিবেশের কিছু শ্রমিক বিশেষ প্রকোষ্ঠে ছত্রাক চাষে নিয়োজিত থাকে। আবার বেশ কিছু শ্রমিক কাঠের গুঁড়ির মধ্যে অথবা মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ এবং গ্যালারী নির্মাণে ব্যস্ত থাকে। আবার কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা মাটির উপর বালি, মল ও লালা মিশিয়ে উই ঢিবি তৈরী করে। এক কথায় শ্রমিক গোষ্ঠী উপনিবেশে বসবাসকারী হাজার হাজার উইপোকার জীবন ধারণের জন্য যা কিছু করণীয় সব কাজই করে থাকে।

(2) **সৈনিক শ্রেণী** (Soldiers) ঃ উপনিবেশের সৈনিক উইপোকারা বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী। এরাও প্রজনন কাজে অক্ষম। এদের কাজ হল উপনিবেশকে শত্রু ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। এদের দেহ বর্ণযুক্ত। মাথাটি তুলনামূলকভাবে বড় এবং চোয়াল প্রলম্বিত। এরাও শ্রমিকদের মত ডানাবিহীন। পুঞ্জাক্ষি থাকে না। কোন কোন উপনিবেশে সৈনিকের কাজ অনুসারে দুই তিন রকম সৈনিক থাকতে পারে।

কোন কোন উপনিবেশে সাধারণ দৃঢ় চোয়ালযুক্ত সৈনিকের পরিবর্তে দীর্ঘ নাক বা দৃঢ় শুঁড়যুক্ত সৈনিক (Nasutes) দেখা যায়। এরা আকৃতিতে ছোট। চোয়াল লুপ্তপ্রায়। মাথার কাছ থেকে একটা লম্বা শুঁড় সামনের দিকে প্রলম্বিত এবং এক ধরনের গ্রন্থিরস নির্গমনের জন্য (Frontal gland) ছিদ্রযুক্ত। যুদ্ধের সময় ঐ গ্রন্থিরস শত্রুর দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ রস কংক্রীটের মত কঠিন জিনিষকে দ্রবীভূত করতে পারে ; ফলে শ্রমিকেরা যখন শক্ত বস্তুতে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে তখন ঐ ধরনের সৈন্যরা সাহায্য করে। এরা আবার দু-তিন রকমের আকৃতিযুক্ত হতে পারে।

চিত্র নং 10
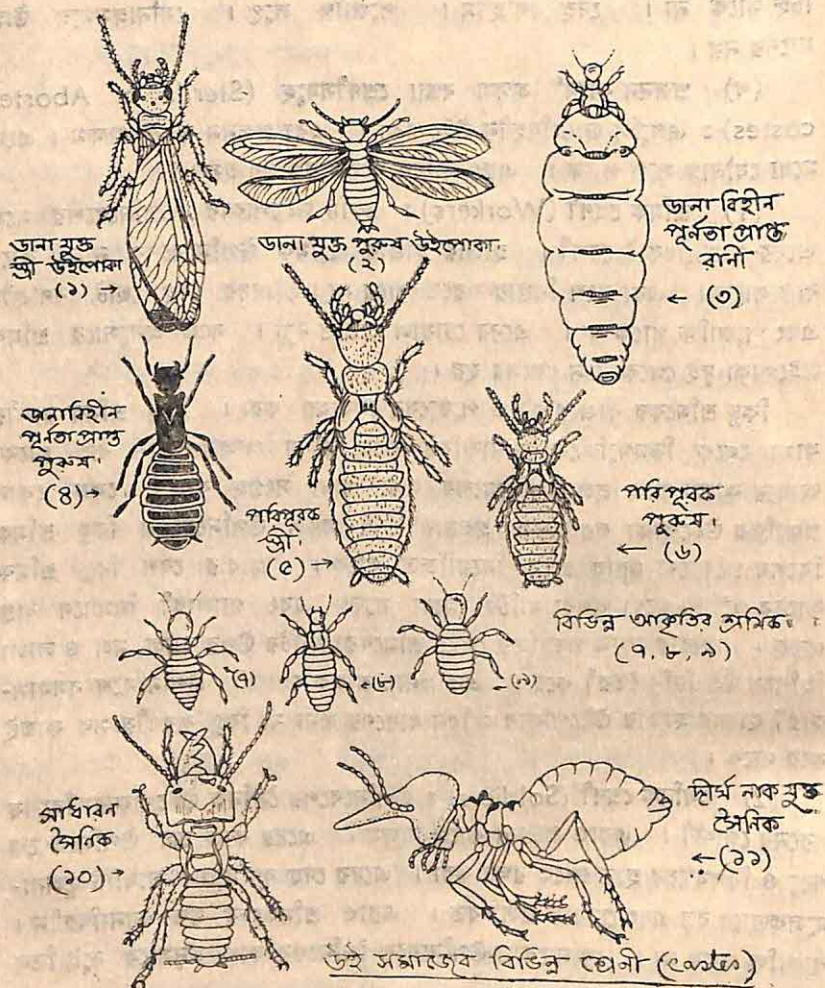
প্রমোদ বিহার (Nauptial Flight) উইপোকার জীবনচক্র শুরু হয় প্রমোদ বিহার থেকে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে অথবা বছরের কোন এক সময়ে এই বিহার শুরু হয়। উপনিবেশের রাজকীয় প্রকোষ্ঠ থেকে পুরুষ ও স্ত্রী উইপোকার নির্গমনের আগে শ্রমিকেরা "রাজপ্রাসাদে"র গায়ে নির্গমনের পথ তৈরী করে। তারপর পূর্ণ ডানাযুক্ত এক ঝাঁক স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকা আকাশে উড়ে যায়। কিছুক্ষণ আকাশে আনন্দ-বিহারের পর এদের ডানা

ঝরে যায় ; কেবল ডানার গোড়াটা বক্ষদেশে আটকে থাকে। তখন তারা মাটির উপর নেমে আসে। অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষের এই আনন্দ-বিহারের সময় মৃত্যু ঘটে। ডানা ঝরার পর মাটির উপর যৌন-মিলন হয়। এরপর প্রজননের জন্য তারা মাটির নিচে রাজপ্রাসাদে বা বিশেষভাবে নির্মিত প্রকোষ্ঠটিতে ফিরে আসে যেটি শ্রমিকেরা আগে থেকে তৈরী করে রাখে! রাণী ডিম পারতে শুরু করে। শুরু হয় নূতন উপনিবেশ। এ সময় রাণীর দেহের আমূল পরিবর্তন ঘটে। উদর স্ফীত হয়। দেহ দীর্ঘ হয়। পেশীসমূহ ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। পাগুলি ছোট হয়ে যায়। ডিমপাড়া ছাড়া তারা সকল কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে। প্রতিদিন গড়ে একটি রাণী উইপোকা চার হাজার ডিম পাড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ছিয়াশি হাজার পর্যন্ত হতে পারে এবং বছরে এক মিলিয়ন ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে প্রথম দিকে যেসব বাচ্ছা হয় তার মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী, যারা পরবর্তী উপনিবেশে অন্যান্য কাজে সহায়তা করে। এইভাবে স্ত্রী উইপোকা আট-দশ বছর ডিম পাড়ার পর যখন তার প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় তখন খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং উপবাসে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর দেহটি শ্রমিক উইপোকারা আনন্দের সঙ্গে খেয়ে ফেলে।

উইপোকার উপনিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। প্রাথমিক স্ত্রী-পুরুষ নির্ধারিত হয় জন্মের সময় এবং অন্যান্য জীবের মতই ক্রোমোজোম সূত্রানুসারে। শ্রমিক ও সৈনিকেরাও প্রাথমিকভাবে স্ত্রী অথবা পুরুষ। কিন্তু পরবর্তীকালে বাচ্চা লালন-পালনের সময় ধাত্রী উইপোকারা যখন বাচ্চাদের সাধারণ খাদ্য খাওয়ায় তখন জনন অঙ্গসমূহ কার্যকারিতা হারিয়ে শ্রমিক ও সৈনিকে রূপান্তরিত হয়। আবার খাদ্যবস্তুর সঙ্গে লালা মিশিয়ে ধাত্রীরা বিশেষ ধরনের যে রাজকীয় খাদ্য তৈরী করে ঐ খাদ্য খাওয়ালে যৌনাঙ্গের পরিস্ফুরণ ঘটে এবং কার্যকরী স্ত্রী-পুরুষ বা রাজা-রাণী সৃষ্টি হয়।

উইপোকা মানুষের কাছে ক্ষতিকারক বলেই বিশেষভাবে চিহ্নিত। কাঠ হল এদের প্রধান খাদ্য। এদের অন্ত্রের মধ্যে এক ধরনের মিথোজীবী এককোষী প্রাণী (Trichonympha Sp. etc.) বাস করে, যারা কাঠের সেলুলোজকে হজমে সাহায্য করে। ফলে এরা দরজা, জানালা, কাঠের গুঁড়ি, অরণ্য উদ্ভিদ প্রভৃতি ধ্বংস করে।

সুতরাং উইপোকা একটি ছোট্ট প্রাণী হলেও বড় বিচিত্র এদের সমাজ জীবন।

পিপীলিকা

পিপীলিকা পৃথিবীর সর্বত্র অত্যন্ত পরিচিত সামাজিক পতঙ্গ। বিখ্যাত

কীট-পতঙ্গবিদ্ Imsms (ইম্‌স্) একটি পিপীলিকা গোষ্ঠীতে 29 রকমের শ্রেণীভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। সচরাচর একটি পিপীলিকার উপনিবেশে 4 রকমের শ্রেণীভেদ দেখা যায়।

(1) **রাণী** ঃ—একটি উপনিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকার মধ্যে রাণীই একমাত্র রাজকীয় সম্মান পেয়ে থাকে। দৈহিক আকৃতিতে রাণীই হল সবচেয়ে বড়। পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির সময় রাণীর দেহে একজোড়া ডানা গজায়। আবার পরিণত বয়সে ঐ ডানা ঝরে যায়। এদের একমাত্র কাজ হল ডিম পাড়া। পিপীলিকার একটি উপনিবেশে কতকগুলি রাণী বাস করে। এদের পরিচর্যার ভার থাকে শ্রমিকদের হাতে। একমাত্র বংশবৃদ্ধি ছাড়া এরা সমাজের জন্যে অন্য কোন কাজ করে না। এদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ।

(2) **পুরুষ** ঃ—রাণীদের অপেক্ষা দৈহিক আকৃতিতে এরা বেশ ছোট হয়। পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির সময় এদের দেহেও একজোড়া ডানা গজায়। সামনের শুঁড় দুটি অত্যন্ত গন্ধ সচেতন। এদের একমাত্র কাজ মিলনের সময় শুক্রাণুর দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা, জন্মসূত্রে এরা রাণীর অনিষিক্ত ডিম থেকে সৃষ্ট হয়।

চিত্র নং 11
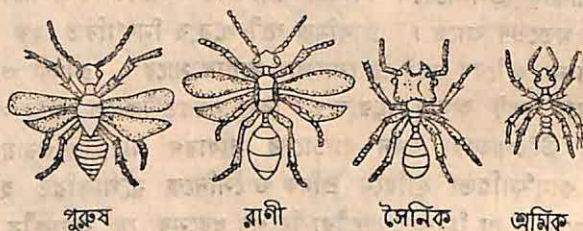
পিপীলিকা

(3) **শ্রমিক**—প্রকৃত পক্ষে এরা প্রজনন ক্ষমতাহীন স্ত্রী পতঙ্গ। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে এদের জন্ম হয়। কিন্তু খাদ্য বৈষম্যের জন্য বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা প্রজনন ক্ষমতারহিত শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এদের ডানা গজায় না। প্রকৃতপক্ষে এরাই শ্রম দিয়ে উপনিবেশকে বাঁচিয়ে রাখে। খাদ্য সংগ্রহ, বাসা তৈরী, রাণী ও পুরুষের পরিচর্যা প্রভৃতি এদের কাজ।

(4) **সৈনিক** ঃ—রূপান্তরিত শ্রমিক থেকেই এদের জন্ম হয়। এদেরও ডানা থাকে না। এরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কঠোর সংগ্রামী। উপনিবেশকে শত্রুমুক্ত করা এবং কঠিন খাদ্যকে গুঁড়া করা এদের কাজ।

বিভিন্ন প্রজাতির পিপীলিকা নিজ নিজ উপনিবেশের জন্যে বিভিন্ন ধরনের

বাসা বাঁধে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মাটির নীচে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠযুক্ত বাসা তৈরী করে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিশেষ কক্ষে রাণী ডিম পাড়ে। শ্রমিক ডিমগুলি তুলে এনে নার্সারীতে রাখে এবং বড় না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে। কোন কোন প্রকোষ্ঠ ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেখানে খাদ্য জমা করা হয়ে থাকে। ভারতীর লাল পিঁপড়ে পাতার সাহায্যে বাসা তৈরী করে। একটি উপনিবেশে 500,000 পর্যন্ত পিপীলিকা বাস করে। কোন কোন প্রজাতির পিপীলিকা অন্য প্রজাতির উপনিবেশকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত উপনিবেশের, পুরুষ এমন কি রাণীকেও বন্দী করে এনে ক্রীতদাস রূপে নিয়োগ করে। তাদের দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ, বাচ্চা লালনপালন প্রভৃতি কাজ করিয়ে নেয়।

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ পিপীলিকাদেরই ডানা গজায়। প্রজননের পূর্বে একঝাঁক স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকা আকাশে উড়তে থাকে। একই সময়ে হয়তো অন্যান্য উপনিবেশ থেকেও এক এক ঝাঁক পিপীলিকা আকাশে উড়ে আসে। এর ফলে গোষ্ঠী বহিভূর্ত পিপীলিকার পারস্পরিক মিলনের সম্ভাবনা থাকে। তারপর এক সময়ে অনেক উঁচু আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-মিলন ঘটে। যৌন-মিলনের পর অধিকাংশ পুরুষই মৃত্যুবরণ করে। রাণী আবার মাটিতে ফিরে আসে। গাছের অজস্র পাতার ভাঁজের মধ্যে সে ডিম পেড়ে নূতন উপনিবেশ তৈরী করে, অথবা পুরনো উপনিবেশে গিয়ে পিপীলিকার সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

মৌমাছি

মৌমাছিও সামাজিক পতঙ্গ। এরা মৌচাক গঠনের মাধ্যমে উপনিবেশ তৈরী করে। সাধারতঃ একটি বড় মৌচাকে 50,000 থেকে 80,000 মৌমাছি বাস করে এবং ছোট মৌচাকে 4,000 থেকে 5,000 মৌমাছি থাকে।

(1) **রাণী** ঃ—একটি মৌচাকে মৌমাছির সংখ্যা যতই হোক না কেন, এদের ক্ষেত্রে রাণীর সংখ্যা একটি। সময়ে সময়ে একাধিক রাণীও দেখা যায়। রাণীর দেহ লম্বা এবং তার একমাত্র কাজ বংশ বৃদ্ধি করা। পরিণত বয়সে রাণী প্রত্যহ প্রায় 200 ডিম পাড়ে এবং সারা জীবনে 1,500,000 ডিম পাড়তে পারে। রাণী কখনও মৌচাক তৈরী অথবা মধু সংগ্রহ প্রভৃতি শ্রমের কাজ করে না।

(2) **পুরুষ** ঃ—একটি মৌচাকে পুরুষের সংখ্যা কয়েকটি থেকে 200 পর্যন্ত দেখা যায়। এদের দেহের গঠন মাঝামাঝি ; দুটি ডানা আছে, এবং চোখ দুটি অত্যন্ত বড়। এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। এদের একমাত্র কাজ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা।

(3) **শ্রমিক** ঃ—সমগ্র উপনিবেশে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আকৃতিতে

রাণী ও পুরুষের চেয়ে এরা ছোট। শক্তিশালী ডানায় ভর করে এরা দীর্ঘপথ উড়ে যেতে সক্ষম। দেহ থেকে মোম নির্গত করে তার সাহায্যে মৌচাক তৈরী করে, তাছাড়া এরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ, রাণী ও পুরুষের সেবা এবং বাচ্চা লালন-পালন করে। এদের দেহে এক ধরনের বিষগ্রন্থি থাকে এবং হুলের সাহায্যে ঐ বিষ শত্রুর দেহে ঢেলে দেয়।

চিত্র নং 12
মৌমাছি

। কেবলমাত্র ডিম পাড়বার জন্যে মৌমাছিরা আকাশে ওড়ে না। গ্রীষ্মকালে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একই স্থানে সংখ্যাবৃদ্ধির চাপ কমাবার জন্যে অনেক মৌমাছি নূতন উপনিবেশ সৃষ্টির আশায় অন্য স্থানে উড়ে যায়। স্থান পরিবর্তনের আগে শ্রমিকেরা মৌচাকের মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু প্রকোষ্ঠ তৈরী করে, যার মধ্যে নূতন রাণী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নূতন রাণী পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির আগেই পুরাতন রাণী কিছু সংখ্যক শ্রমিক ও পুরুষকে নিয়ে অন্যস্থানে চলে যায়। ফেলে যাওয়া মৌচাকটি থেকে প্রথম যে স্ত্রী-বাচ্চা বেরিয়ে আসে, সেই হয় কুমারী রাণী এবং পরে যে সমস্ত বাচ্চা বেরিয়ে আসে, তাদেরকে হত্যা করে কুমারী রাণী সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কারণ ভাবী রাণী কখনও অন্য স্ত্রী-মৌমাছির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করে না। কোন কোন সময় খাদ্যের অভাবের জন্যে পুরনো মৌচাক ফেলে সকলে উড়ে যায়।

মৌমাছিরা ডিম পাড়বার জন্যে যে আকাশে ওড়ে তা পূর্বোক্ত আকাশে ওড়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এক্ষেত্রে একমাত্র কুমারী রাণীই আকাশে ওড়ায় অংশগ্রহণ করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে আসবার এক সপ্তাহের মধ্যে ভাবী রাণী এক ঝাঁক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে ওড়ে। উন্মুক্ত আকাশে স্ত্রী ও পুরুষদের যৌন মিলন হয়। স্ত্রী মৌমাছি দেহমধ্যস্থিত থলিতে অজস্র শুক্রাণু জমা করে নেয়। ফলে রাণী জীবদ্দশায় যত ডিম পাড়ে, সেই সব ডিমকে নিষিক্ত করতে পারে। সাধারণতঃ একবার যৌন মিলনের পর দ্বিতীয়বার

মিলনের দরকার হয় না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলনের শেষে আহত পুরুষের মৃত্যু ঘটে। রাণী মৌচাকে ফিরে আসে এবং বৃদ্ধ বয়সে স্থান পরিবর্তনের কাজে আর কখনও মৌচাকের বাইরে যায় না।

রাণী মৌমাছি যে ডিমগুলি পাড়ে, তার মধ্যে নিষিক্ত ডিম থেকে স্ত্রী-মৌমাছি এবং অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ-মৌমাছি জন্মায়। বাচ্চা স্ত্রী-মৌমাছিকে শুশ্রূষারত শ্রমিক যদি মুখের লালামিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ মধু পান করায়, তবেই বাচ্চার প্রজনন যন্ত্রগুলি পরিণত রূপ ধারণ করে। এরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী রাণীতে রূপান্তরিত হয়। আর যদি শ্রমিকেরা কেবল বাঁচিয়ে রাখাবার জন্যে সাধারণ মধু পান করায়, তবে বাচ্চার প্রজনন যন্ত্রগুলি বর্ধিত হয় না এবং জন্মসূত্রে স্ত্রী-মৌমাছি বন্ধ্যা স্ত্রীতে পরিণত হয়।

সঙ্গীর সন্ধানে

সামাজিক প্রাণী দল বেঁধে বাস করে। সেখানে এক একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী এক একটি সামাজিক কাজ সম্পন্ন করে এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজ-বদ্ধ উপনিবেশকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু সমাজবদ্ধ নয় অথচ দল বেঁধে বাস করে, পৃথিবীতে এ রকম প্রাণীর সংখ্যাও কম নয়। পাখীদের মধ্যে পায়রা, হাঁস, বক প্রভৃতি নানা প্রজাতির পাখী এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হরিণ, হাতী প্রভৃতি প্রজাতি দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। ফলে এদের আত্মরক্ষার সুবিধা হয়; প্রজনন কালে সঙ্গী খোঁজার সুবিধা হয় এবং বাচ্চা লালন-পালনেরও সুবিধা হয়। বাচ্চারা দলের সঙ্গে থেকে পরবর্তী জীবনের জন্য অনেক কিছু অভ্যাস বড়দের কাছে শিখে নেয়।

কিন্তু প্রকৃতিতে এমন অনেক জীব আছে যারা একক ভাবে বাস করে। তারা জন্মের পর যেমন জন্মদাতাদের খবর জানে না, তেমনি বয়সকালে তাদের কোনো স্থায়ী সঙ্গীও থাকে না। কেবল প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী অথবা পুরুষ বংশ রক্ষার জন্য নিজ নিজ অস্থায়ী সঙ্গী খুঁজে নেয়। বাকী সময় যে যার নিজের পথে ঘুরে বেড়ায়। প্রজাপতি, বিছা, মাকড়সা, শামুক প্রভৃতি অমেরু-দণ্ডী প্রাণী এবং অধিকাংশ মাছ, ব্যাঙ, সাপ, গিরগিটি প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একলা চলার পদ্ধতিটাই বেশী দেখা যায়। এই সব প্রজাতির প্রাণীরা যেমন নিজের সন্তানদের চেনে না, সন্তানরাও বাবা, মার খোঁজ রাখে না। কিন্তু বংশ রক্ষার জন্য যৌন্ মিলনের আগে এই সব একক প্রাণীর সঙ্গী খোঁজার পদ্ধতি বড় বিচিত্র। কেউবা দেহ থেকে গন্ধ ছড়ায়, কেউবা বিচিত্র শব্দ করে, আবার কেউ বা দেহের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়ে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা অথবা শব্দ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অথবা বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়ে এরা প্রজনন ঋতুতে পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়।

গ্রেলিং প্রজাপতি

এরা সামাজিক পতঙ্গ নয়! বর্ষাকালে সাধারণতঃ এরা একা একা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। পুরুষ গ্রেলিং প্রজাপতি অত্যন্ত গন্ধ-সচেতন। ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক সময়ে পুরুষ প্রজাপতি মাটির উপরে অথবা গাছের ডালে অত্যন্ত সজাগ হয়ে চুপ করে বসে থাকে। যখনই নিজ গোষ্ঠীর অন্য কোন প্রজাপতি এদের পাশ দিয়ে উড়ে যায়, তখনই ঐ সজাগ পুরুষ প্রজাপতি তার

পিছু ধাওয়া করে। উড়ন্ত প্রজাপতি যদি স্ত্রী জাতের হয়, তাহলে সেও এক-সময় মাটিতে বসে পড়ে। পুরুষ-প্রজাপতিটি তখন অগ্রসর হয়ে তার মুখোমুখি বসে। যদি স্ত্রী-প্রজাপতিটি সঙ্গে সঙ্গে ডানা তুলে সম্মতি জানায় তাহলে উভয়ের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়। আর যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে পুরুষ-প্রজাপতিটি তার মনোরঞ্জনের জন্যে নানা রূপ অঙ্গভঙ্গী শুরু করে। প্রথমে ডানায় একটু ঝাঁকা দেয়, পরে এমন ভাবে ডানা দুটি মেলে ধরে
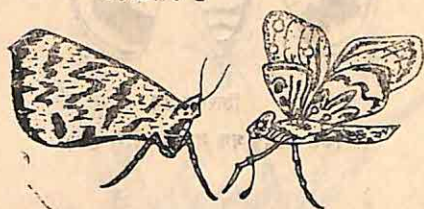
চিত্র নং 13

পুরুষ গ্রেলিং প্রজাপতির নৃত্য

যাতে, সাদার উপরে চমৎকার কালো দাগগুলি স্ত্রী-প্রজাপতিকে আকৃষ্ট করে। এর পর সম্মুখভাগের পাখাদুটি তুলে স্ত্রী-প্রজাপতির সামনে এমনভাবে মাথা নেড়ে বশ্যতা স্বীকার করে, যাতে সহজেই স্ত্রী-প্রজাপতি সাড়া দেয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে সামনের শুঁড় দুটি ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাকে এবং সর্বশেষে পেটের তলায় আস্তে আস্তে নাড়া দেয়। এইভাবে মনোরঞ্জনের পালা শেষ হলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়। এরপর অবশিষ্ট জীবনে গ্রেলিং প্রজাপতি একা একা বিচরণ করে এবং আর কখনও উভয়ে মিলিত হয় না।

সাইকিড মথ

স্ত্রী সাইকিড মথেরা উড়তে পারে না। কারণ তারা সাধারণতঃ ডানাবিহীন। স্ত্রী মথেরা গুটি থেকে বেরিয়ে কাছে-পিঠেই আশ্রয় নেয় এবং আশ্রয়স্থল থেকে তারা মোটেই অগ্রসর হতে পারে না। পুরুষ মথেরা উড়তে পারে। তাদের শক্ত ডানা আছে। পুরুষ মথের শুঁড় দুটি পালকের মত এবং অত্যন্ত গন্ধ-সচেতন। গুটি থেকে বেরিয়েই তারা খুঁজে বেড়ায় স্ত্রী মথকে। স্ত্রী মথের দেহ থেকে এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ বের হয়, যা পুরুষ মথকে আকর্ষণ করে। পুরুষ মথ শুঁড়ের সাহায্যে বহুদূর থেকে—এমন কি, দু-তিন মাইল দূর

থেকেও স্ত্রী মথকে খুঁজে বের করে পরস্পরে মিলিত হয় এবং তারপর স্ত্রী মথ ডিম পাড়ে।
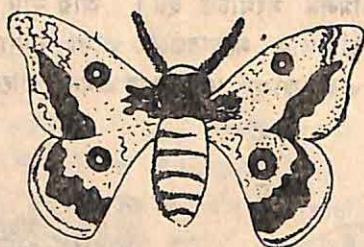
চিত্র নং 14
সাইকিড মথের গন্ধ সচেতনশীল শুঁড়

কাঁকড়া বিছা

কাঁকড়া বিছা সন্ধিপদ পর্বের আরেকটি প্রাণী। এদের স্ত্রী-পুরুষে মিলন সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানী Fabre অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। যৌন-মিলনের পূর্বে তারা মুখোমুখি হয় এবং লেজের দিকটি উপরের দিকে তুলে অবস্থান করে। তারপর পুরুষটি তার সামনের বড় দাঁড়াটি দিয়ে স্ত্রী বিছার বড় দাঁড়াটি ধরে এবং তাকে ঘিরে 30 মিনিট থেকে 120 মিনিট পর্যন্ত সে নাচতে থাকে।

চিত্র নং 15
নৃত্যরত কাঁকড়াবিছা

এই সময় সোঁ সোঁ করে এমন শব্দ করে, যা বেশ দূর থেকেও শোনা যায়। এই নাচের পর স্ত্রী-বিছা পুরুষ-বিছার সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়। পুরুষ-বিছাটি তখন মিলনস্থলের জন্যে গর্ত খুঁজতে বেরিয়ে যায় এবং স্ত্রী-বিছা তাকে পিছুপিছু অনুসরণ করে। অবশেষে নির্দিষ্ট গর্তে তারা মিলিত হয় এবং

মিলনের শেষে স্ত্রী-বিছা পুরুষ-বিছাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে খেয়ে ফেলে।

মাকড়সা

এরা কাঁকড়া বিছার সমগোত্রীয় প্রাণী। পুরুষ-মাকড়সা স্ত্রী-মাকড়সার চেয়ে অনেক ছোট। যৌন-মিলনের আগে পুরুষ মাকড়সা একটি ছোট সুন্দর জাল বোনে। এরপর পুরুষ মাকড়সাটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্ত্রী মাকড়সার
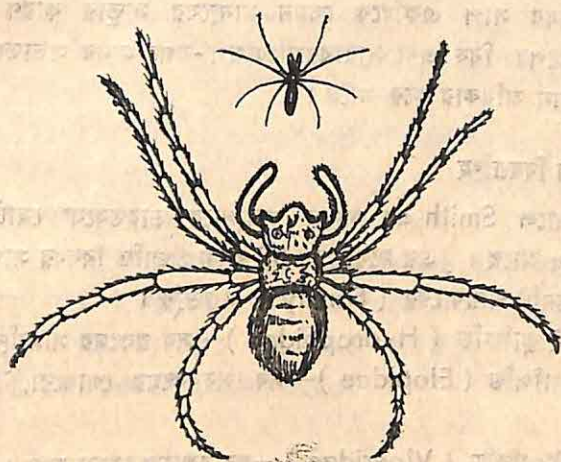
চিত্র নং 16
উপরে পুরুষ মাকড়সা, নীচে স্ত্রী মাকড়সা

খোঁজে তার জালে এসে উপস্থিত হয়। এখানে এসে নানা রকম ভঙ্গিমার সাহায্যে সে স্ত্রী-মাকড়সার চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করে। অবশেষে সম্মতি পেলে উভয়ে মিলিত হয়। মিলনের পর অধিকাংশ স্ত্রী-মাকড়সাই পুরুষকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে।

সাপ ও সাপের বিষ

অনেক সময় খবরের কাগজে দেখা যায় ওঝারা সাপেকাটা রোগীর ক্ষতস্থান থেকে মুখ দিয়ে চোষণ করে রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে। সাধারণ মানুষ এ সমস্ত ঘটনাকে এক অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে করেন। আসলে সাপের বিষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় সাপ সম্বন্ধে মানুষের একটা সাধারণ আতঙ্ক থাকে। বিষধর সাপ একদিকে যেমন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, অন্যদিকে সাপের বিষ এবং সাধারণভাবে সর্প-জগৎ মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বিষধর সাপের বিষগ্রন্থি

1943 সালে Smith-এর গণনা অনুসারে ভারতবর্ষে মোট 216 রকম প্রজাতির সাপ আছে। এর মধ্যে মাত্র 52 রকম প্রজাতি বিষধর সাপ। বিষধর সাপগুলো তিনটি পরিবারের (Family) অন্তর্ভুক্ত।

ক) হাইড্রোফিডি (Hydrophidae)—সব রকমের সামুদ্রিক সাপ।

খ) এলাপিডি (Elapidae)—সব সবরকমের গোখরো, কেউটে এবং চিতি সাপ।

গ) ভাইপারিডি (Viperidae)—সব রকমের বোরা সাপ।
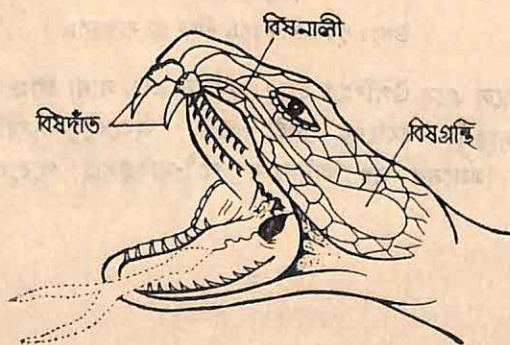
চিত্র নং 17

বিষধর সাপের বিষগ্রন্থি

সব বিষধর সাপের চোখের পিছন দিকে, কিন্তু মুখের ভিতরে একজোড়া

বিষগ্রন্থি থাকে। এই বিষগ্রন্থি হ'ল পরিবর্তিত লালাগ্রন্থি, যার মধ্যে থাকে কিছু সংখ্যক বিশেষ ধরনের কোষ। ঐ কোষগুলি থেকে বিভিন্ন রকমের এনজাইম নির্গত হয় এবং লালাগ্রন্থিকে বিষগ্রন্থিতে রূপান্তরিত করে। প্রতিটি বিষগ্রন্থি থেকে একটি করে সরু নল সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে আসে এবং বিষদাঁতের গোড়ায় গিয়ে এটি শেষ হয়। বিষধর সাপের উভয় চোয়ালে প্রচুর ছোট ছোট দাঁত থাকে। এর মধ্যে উপরের চোয়ালের সামনের দিকে যে দুটি বিশেষ ধরনের বড় দাঁত থাকে, সে দুটিকে বিষদাঁত বলে। বিষহীন সাপের বিষদাঁত থাকে না এবং সব দাঁতই ছোট ছোট। বিষদাঁত দু-রকমের হয়—

ক) ফাঁপা বিষদাঁত—এই ধরনের বিষদাঁতের মধ্য দিয়ে একটা সরু নালী থাকে এবং অগ্রভাগে ছিদ্র থাকে। এই ধরনের বিষদাঁত বোরা সাপের দেখা যায়। এটি ইচ্ছামত ঘোরানো যায়।

খ) খোলা নালীযুক্ত বিষদাঁত—এই ধরনের বিষদাঁতের গায়ে একটি খোলা সরু নালী থাকে, যা দাঁতের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি গোখ্রো, চিতি ও সামুদ্রিক সাপের মধ্যে দেখা যায়। এটি ঘোরানো যায় না।

সামগ্রিকভাবে বিষযন্ত্র ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মত কাজ করে। সাপ কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিষগ্রন্থিতে চাপ পড়ে এবং বিষগ্রন্থি থেকে তরল বিষ নির্গত হয়ে, নালী দিয়ে বিষ দাঁতে আসে এবং ক্ষতস্থানে বিষ ঢেলে দেয়। বিষদাঁত ভেঙ্গে গেলে নতুনভাবে গজাতে পারে।
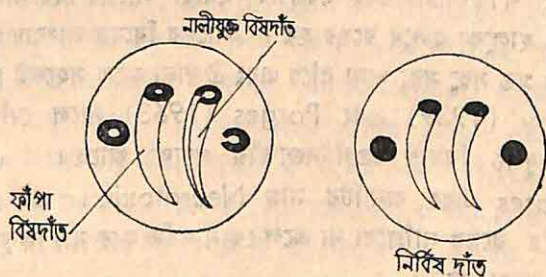
চিত্র নং 18
সাপের বিষদাঁত

বিষ নির্গমনের পরিমাপ

একটি বিষধর সাপ একবার কামড়ালেই বিষ শেষ হয়ে যায় না। পর পর কয়েকবার কামড়ালেও প্রতি কামড়ের সঙ্গে বিষ থাকে। বোম্বাইয়ের হফ্‌কিনস্ ইনস্টিটিউটে ডঃ দেবরাজ 1959 সালে এক নিরীক্ষা চালান। প্রতি এক মাস

অন্তর তিনি কয়েকটি ভারতীয় বিষধর সাপের বিষ নির্গমনের পরিমাপ গ্রহণ করেন এবং ঐ বিষকে শুষ্ক করে তিনি যে ওজন নেন, তা নীচে দেওয়া হল।

	সাপের নাম	প্রতিমাসে সংগৃহীত শুষ্ক বিষের পরিমাপ	মানুষের মৃত্যু ঘটাবার জন্য ঐ বিষের সর্বোচ্চ পরিমাপ
1.	গোখ্রো (Cobra)	0·2 গ্রাম	12 মিলি গ্রাম
2.	চন্দ্রবোরা (Russels Viper)	0·15 ,,	15 ,, ,,
3.	চিতি (Krait)	0·022 ,,	6 ,, ,,
4.	একিস বোরা (Echis)	0·0046 ,,	8 ,, ,,

বিষধর সাপ জন্মের প্রথম দিন থেকে অর্থাৎ ডিম থেকে বের হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ ধারণ করে। কিন্তু বিষের পরিমাপ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন রকম হয়। তাছাড়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষের পরিমাণও বাড়ে। শীতকালে পরিমাণ কমে, গ্রীষ্মে সবচেয়ে বেশী হয়। স্ত্রী-সাপের চেয়ে পুরুষ-সাপের বিষের পরিমাণ বেশী।

বিষের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

গোখ্রো সাপের বিষ টাট্কা অবস্থায় স্বচ্ছ ও হালকা হলুদ রঙের। কিছুটা ঘন; শীতকালে ঘনত্ব বেশী। বোরা সাপের বিষ সাধারণতঃ সাদা, কখনও কখনও হাল্কা হলুদ রঙের হয়। সাপের বিষের আস্বাদ অম্ল। শুষ্ক অবস্থায় সূচের মত সরু সরু দানা বাঁধে এবং ঐ দানা জলে সহজেই দ্রবীভূত হয়।

Kellaway (1939) এবং Porges (1963) সালে দেখিয়েছেন যে, সাপের বিষে দু'টি বিষাক্ত প্রোটিনজাতীয় পদার্থ আছে। একটির নাম Phosphatidases এবং অন্যটির নাম Neurotoxin। এই দু'টি বিষাক্ত পদার্থ সরাসরি রক্তের সান্নিধ্যে না এলে কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু পেটের মধ্যে গেলে হজমে সাহায্য করে।

এই দুটি বিষাক্ত পদার্থ ছাড়া সাপের বিষে অন্য যে সমস্ত এনজাইম থাকে, সেগুলির নাম ও কার্যকারিতা নীচে দেওয়া হল।

ক) Proteoses—এটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে হজম করতে সাহায্য করে।

খ) Erepsim—এটিও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে হজম করতে সাহায্য করে।

গ) Cholinesterase—এই এনজাইম গোখরো সাপের বিষের মধ্যেই

দেখা যায়। এটি choline এবং acetic acid প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

ঘ) Hyaluronidase—এটি বিষকে স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে সাহায্য করে।

ঙ) Ribonuclease and Deoxyribonuclease—এগুলি অন্যান্য এনজাইমের কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করে বিষকে আরও শক্তিশালী করে।

চ) Ophio-Oxidase—এই এনজাইম বিষাক্ত নয়। এটি পরিপাক ক্রিয়ায় এবং খাদ্যকে পাচনে সাহায্য করে।

ছ) Lecithinase—এটি ধমনী ও শিরার প্রাচীরকে জারিত করে।

সুতরাং বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাপের ক্ষেত্রে এগুলি প্রধানতঃ হজমেই সাহায্য করে।

মানব দেহে সাপের বিষের ক্রিয়া

মানবদেহে Phosphatidases এবং Neurotoxin বিষের কাজ করে। উক্ত দু'টি পদার্থ একই সাপের বিষে থাকে না। সুতরাং সাপের বিষে দু রকমের এবং মানবদেহে এদের ক্রিয়াও দু ধরনের।

ক) **ভাসোটক্সিন ঃ**—এ ধরনের বিষে Phosphatidases এনজাইম থাকে। সাধারণতঃ বোরা সাপের বিষেই এটি দেখা যায়। সাপে কামড়াবার পর এই এনজাইম রক্তের সান্নিধ্যে এলে এটি লোহিত কণিকার উপর ক্রিয়া সুরু করে এবং কণিকাকে ভেঙ্গে ফেলে (Haemolysis)। Lecithinase নামক এনজাইমটি পূর্বোক্ত এনজাইমের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করে। এটি শরীরের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রের উপর যে পাতলা আবরণী (Endothelium) থাকে, তার কোষ-প্রাচীরের উপর ক্রিয়া করে। Lecithinase কোষস্থ Oleic acid-কে ভেঙ্গে Lysolecithin নামক আর একটি পদার্থের সৃষ্টি করে। Lysolecithin দ্রুত পাত্‌লা আবরণীর কোষ প্রাচীরকে জারিত করে শিরা ও ধমনীর প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলে। ফলে ফুসফুসের ভিতর প্রচুর রক্তপাত হয়। দেহের মধ্যে অন্যান্য স্থানেও রক্তপাত হয়ে থাকে। হৃৎপিণ্ডের কলার উপরেও নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

খ) **নিউরো-টক্সিন**—এ ধরনের বিষ প্রধানতঃ গোখরা ও চিতি সাপে দেখা যায়। এটি স্নায়ুতন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। দেহ ক্রমশঃ অবশ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসে।

সাপে কামড়াবার লক্ষণ

গোখ্‌রো ও কেউটে—এই সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে লাল দাগ হয় এবং অল্প জ্বালা করে। প্রায় আধঘণ্টা বাদে রোগীর ঘুমের ভাব দেখা যায় এবং কিছুটা নেশাচ্ছন্ন হয়। পাগুলি দুর্বল হয়ে আসে এবং বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। 40 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টার মধ্যে মুখ দিয়ে প্রচুর লালা গড়াতে থাকে। বমিও হতে পারে। এর পর ধীরে ধীরে দেহ অবশ হয়ে আসে। জিহবা ও গলনালী ফুল্‌তে আরম্ভ করে। ফলে রোগী কথা বলতে ও ঢোক গিলতে পারে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শরীর সম্পূর্ণ অবশ হয়ে আসে। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হয়, হৃদস্পন্দন বাড়ে। এক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়।

চিতি—এই সাপে কামড়ালে লক্ষণগুলি গোখরোর মতই দেখা যায়, কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারে থাকে না। ঘুমের ভাব আরও বেশী হয়। তবে চিতি সাপে কামড়ালে প্রস্রাবের সঙ্গে অ্যালবুমেন থাকতে পারে।

বোরা—এই সাপের দংশনে ক্ষতস্থান লাল হয় এবং তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়। 15 মিনিটের মধ্যেই ক্ষতস্থান ফুলতে সুরু করে এবং দূষিত রক্ত নির্গত হতে পারে। জ্বালার তীব্রতা বাড়তে থাকে। চোখের তারা উপরে উঠে যায়। 1 ঘণ্টার মধ্যেই রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের কিছুটা উপরে রুমাল, রবারের দড়ি অথবা একখণ্ড কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধনের প্রয়োজন, যাতে রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে বিষ দেহের অন্যান্য স্থানেও ছড়াতে না পারে। তার দুটি বিষদাঁতের ক্ষতস্থানে $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি গর্ত করে কেটে ফেলে দূষিত রক্তকে চুষে অথবা পাম্পের সাহায্যে বের করতে হবে। মাঝে মাঝে Epsom লবণ জল কাপড়ে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে দিলে অভিস্রবণের (Osmosis) সাহায্যে দূষিত লসিকাকে (Lymph) বের করতে সাহায্য করে। অল্প পরিমাণ Potassium permanganate জলে গুলে ক্ষত স্থানে দিলে জারণ-ক্রিয়ার সাহায্যে বিষকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারে। কিন্তু শুকনো দানা বা ঘন করে গুলে কখনই দেওয়া উচিত নয়।

মুখের সাহায্য চোষণ অপেক্ষা যন্ত্রের সাহায্যেই বিষাক্ত রক্ত বের করা উচিত। কারণ চোষণকারী মুখে যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহলে বিষ তার রক্তের সান্নিধ্যে আসতে পারে এবং এর ফলে সমূহ বিপদ ঘটতে পারে।

সিরাম চিকিৎসা

বিভিন্ন সাপের বিষ সংগ্রহ করে স্তন্যপায়ী জন্তু, সাধারণতঃ ঘোড়ার রক্তে

অল্প পরিমাণে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিষের পরিমাণ এমন হওয়া চাই, যাতে ঘোড়ার প্রাণ সংশয় না হয়। এতে ঘোড়ার প্লাজমায় উক্ত বিষকে ধ্বংস করবার জন্য কিছু Antiboby তৈরী হয়।

কিছুদিন পরে ঘোড়ার শরীরে আরও একটু বেশী পরিমাণে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তখন প্লাজমায় আরও বেশী Antibody তৈরি হয়। বিষের পরিমাণ ক্রমশ যদি নিরীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, ঘোড়ার প্লাজমায় এতবেশী Antibody তৈরী হয়েছে যে, ঐ ঘোড়ার প্লাজ্মা সংগ্রহ করে সাপের বিষের প্রতিষেধক তৈরী করা যায় এবং এটি Antivenin নামে বাজারে বিক্রী হয়। বিভিন্ন সাপের বিষের ক্রিয়া যেমন আলাদা, Antivenin-ও তেমনি আলাদা হবে। এখন গোখ্‌রা, চিতি, বোরা সাপের Antivenin নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে Polyvalent anti-snake serum তৈরী করা হয়। কোন সাপে কামড়েছে জানা না গেলে প্রথমে ঐ সিরামই ইনজেকশন দেওয়া হয়।

মানবসভ্যতায় সাপ

বিষধর সাপ যেমন মৃত্যুর কারণ, তেমনি এই সভ্য জগতে মানব সমাজে সাপের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই কারণেই বোধ হয়, হিন্দুশাস্ত্রে সাপকে মনসাদেবীর বাহন হিসেবে পূজা করবার বিধান দেওয়া হয়েছে। সর্প-দেবতার পূজা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হয়ে থাকে। সাপের উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(1) রোডেণ্ট দমনে সাপ—কৃষকদের ক্ষেতে যখন ধান, গম প্রভৃতি শস্য পেকে ওঠে তখন মানুষের পরম শত্রু হিসাবে ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি জন্তুরা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট করে। রোডেণ্ট জাতীয় জন্তুদের দমন করার জন্য সাপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পৃথিবীর সবদেশের লোকই এখন যথেষ্ঠ সচেতন।

(2) খাদ্য হিসাবে সাপ—ময়াল সাপ (পাইথন) ভারতবর্ষ, চীন, এবং ব্রহ্মদেশে খাদ্য হিসাবে প্রচলিত আছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমী দেশগুলিতে ময়াল সাপের মাংস হোটেল রেস্টুরেণ্টে সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আদিবাসীরা অন্যান্য বিষহীন সাপকেও খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

(3) বেদেদের জীবিকা—বিভিন্ন দেশে জীবন্ত সাপের খেলা দেখিয়ে বেদেরা জীবিকা অর্জন করে।

(4) সাপের চামড়া—সাপের চামড়ার চাহিদা যথেষ্ট। বেল্ট, জুতা, হাতব্যাগ, চিরুণী, সিগারেট এবং তামাক রাখবার কেস প্রভৃতি তৈরী করতে কাজে লাগে। এমনকি, খেলাধূলার জন্য জ্যাকেট, ক্যাপ, নেকটাই প্রভৃতিও

এর দ্বারা তৈরী হয়। সাপের চামড়া দিয়ে জুতোর উপরিভাগ ঢাকবার জন্য বাজারে এর প্রচুর চাহিদা। বই বাঁধাইয়ের কাজেও এর চাহিদা কম নয়। Dr. Klauber-এর হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ, নেদারল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশ থেকে বছরে 45 লক্ষ টাকার সাপের চামড়া পশ্চিমী দেশগুলোতে পাঠান হত।

(5) সাপের চর্বি—আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এটি একটি প্রয়োজনীয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; বোরা সাপের চর্বি থেকে যে তেল তৈরী হয়, তা টিউমার, অবশ হাত-পা এবং মোচড়ানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(6) সাপের বিষের এনজাইম—সাপের বিষের বিভিন্ন এনজাইমকে বায়োকেমিস্টরা বিভিন্ন কাজে প্রয়োগের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছেন।

(7) ঔষধ হিসাবে সাপ—বিভিন্ন চিকিৎসায় সাপের বিষ খুবই উপকারী। Chopra এবং Chouhan 1940 সালে দেখিয়েছেন যে, গোখরো সাপের বিষ স্নায়ুকুষ্ঠ (Neural leprosy) রোগে বিশেষ উপকারী। ঐ বিষ ক্রনিক স্নায়ুযন্ত্রণায়, পা ও হাতের গাঁটের যন্ত্রণায় (Arthritis) এবং মৃগী রোগে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্সার, মাথার যন্ত্রণা এবং স্নায়ুযন্ত্রণা প্রশমনে গোখরো সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। Pradhan এবং Patwabardhan (1941) বলেছেন যে, Haemophilia রোগ এবং জরায়ুতে রক্তপাত উপশমে বোরা সাপের বিষ খুবই কাজে লাগে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সাপের বিষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বাদুড়

বাদুড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল কম নয়। পৃথিবীতে তেরশ বিভিন্ন জাতের বাদুড় আছে। তার মধ্যে ভারতেই আশি রকম বিভিন্ন জাতের বাদুড় দেখা যায়। সবচেয়ে বড় বাদুড়ের দেহ এক ফুটের-ও বেশী লম্বা হয়, আর প্রসারিত ডানার দৈর্ঘ্য হয় প্রায় পাঁচ ফুট। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বাদুড়ের দৈর্ঘ্য ডানাসমেত প্রায় তিন ইঞ্চি; ওজন আধ আউন্সেরও কম।

বাদুড়ই হল একমাত্র স্তন্যপায়ী জীব, যারা পাখীদের মত দীর্ঘ সময় আকাশে উড়তে পারে। দেখতে কুৎসিত; মুখটা শেয়ালের মত, কান দুটি দেহের তুলনায় বড়। লোমে আবৃত বুকের উপর থাকে—স্তনযুগল। উপরের হাত দুটিকে কেন্দ্র করে পাতলা রবারের মত দুটি ডানা দেহের পাশ দিয়ে এসে দুটি পা ও লেজকে ঘিরে রয়েছে। লম্বা হাতের আঙ্গুলগুলি ডানার সঙ্গে জড়ানো। ওড়বার সময় আঙ্গুলগুলি ডানার আন্দোলনে সাহায্য করে, আর বিশ্রামের সময় ডানা দুটিকে ভাঁজ করে রাখে। এদের স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধশক্তিসম্পন্ন। অনেকে খায় ফলমূল, অনেকে খায় কীটপতঙ্গ। এরা থাকে অন্ধকার গুহা, পোড়ো বাড়ী অথবা পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে। পা দুটি উপরের দিকে তুলে কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে এরা ঝুলে থাকে।

বাদুড় যখন কাজ করে, তখন এদের রক্ত হয় উষ্ণ, আর যখন এরা বিশ্রাম করে তখন এদের রক্ত হয় শীতল। এরা দ্রুত শরীরের উত্তাপ কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। তখন এদের হৃদ্স্পন্দন এক মিনিটে আশি থেকে নেমে তিন হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সেকেণ্ডে আট থেকে মিনিটে আট হয়। গ্রীষ্মে খাবার খেয়ে দেহে কিছুটা চর্বি জমলেই এরা শীতঘুমে অচেতন হয়ে থাকে। ঐ অবস্থায় কোন খাবার না দিয়েও এদেরকে কয়েক মাস জীবন্ত অবস্থায় হিমঘরে রাখা যায়।

সাধারণভাবে স্তন্যপায়ীদের আয়ুষ্কাল তার দেহের আকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। একটি পূর্ণবয়স্ক বাদুড়ের আয়ুষ্কাল সাধারণতঃ কুড়ি-পঁচিশ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, সারা জীবন এরা সুস্থ, সবল এবং নীরোগ থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এক বছরের একটি বাদুড়ের ধমনী-প্রাচীর এবং কুড়ি বছরের একটি বাদুড়ের ধমনী-প্রাচীরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই; রক্তের চাপও একই রকম। কি করে এটা সম্ভব হয়,—হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞরা সে বিষয়ে গবেষণা করছেন।

বাচ্চা প্রসবের ব্যাপারেও এদের সঙ্গে অন্য স্তন্যপায়ীদের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী-বাদুড় হচ্ছে একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী; যারা পুরুষ-বাদুড়ের শুক্রাণুকে নিজের দেহে ধারণ করে দীর্ঘদিন তাকে জীবিত অবস্থায় রেখে দিতে পারে। ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রী-বাদুড় ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে

বাচ্চার জন্ম দিতে পারে।

সাধারণতঃ বাদুড় জুন-জুলাই মাসে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে এবং সেটি মায়ের বুকেই পালিত হয়। স্ত্রী-বাদুড় গর্ভবতী হলে পুরুষ-বাদুড় একাকী অবস্থান করতে ভালবাসে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো বাদুড় এক রকম শব্দ উৎসারণ করে এবং সেই শব্দের সাহায্যে নৈশ বিহারের সময় পথ অনুসরণ করতে পারে। বাদুড় এক ধরনের বীপ বীপ শব্দ করে এবং সেই শব্দ বায়ুর মধ্যে শব্দোত্তর তরঙ্গের (Ultrasonic sound) সৃষ্টি করে, যা মানুষের কর্ণেন্দ্রিয়ে পেঁছায় না। সেই শব্দ কোন বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিধ্বনির আকারে আবার বাদুড়ের কাছে ফিরে আসে। সেই প্রতিধ্বনির সাহায্যেই বাদুড় তার চলার পথের বাধা অতিক্রম করে সঠিক খাদ্যের অবস্থান নিরূপণ করতে পারে। মানুষের উদ্ভাবিত রেডারের ক্রিয়া-কৌশলও অনেকটা এই রকম। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বাদুড়ের শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎসারণ ও প্রতিশব্দের তরঙ্গ সৃষ্টির ক্ষমতা, মানুষের উদ্ভাবিত যে কোন রেডার যন্ত্র অপেক্ষা এক বিলিয়ান গুণ বেশী সংবেদনশীল।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা-গবেষণা কেন্দ্রে বাদুড়কে নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা চালানো হয়। একটি অন্ধকার ঘরে চুলের মত সরু তার আঠাশটি করে ছাদের নানা দিকে ঝুলানো হয় এবং ঐ ঘরে এক সঙ্গে সত্তরটি লাউড স্পীকার বাজানো হয়। লাউড স্পীকার থেকে উৎসারিত শব্দ-তরঙ্গ বাদুড়ের বীপ বীপ শব্দের প্রতি-তরঙ্গ অপেক্ষা দু-হাজার গুণ বেশী ছিল। সব লাউড-স্পীকার বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে বাদুড়গুলিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাদুড়ের কর্ণেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্ম যে, তারা নিজেদের উৎসারিত শব্দের প্রতি-তরঙ্গ অনুসরণ করে অতগুলি ঝুলানো তারের ফাঁক দিয়ে ঠিকভাবে উড়ে যেতে সক্ষম হয়। তারের সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগেনি।

বাদুড় অন্ধকারে আহার্য পতঙ্গদের, শব্দতরঙ্গের সাহায্যে চিনে নেয় এবং অখাদ্য পতঙ্গদের পরিহার করে! শিকার অনুসরণের সময় বাদুড় প্রতি সেকেণ্ডে দুই হাজার "বীপ" শব্দ উৎসারিত করে।

চিত্র নং 19

বাদুড়

ভারতীয় প্রাইমেট

(নন-হিউমেন)

প্রাইমেট হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি শ্রেণী মানুষও যার অন্তর্গত। সুতরাং এই শ্রেণীর মধ্যে যে সব জন্তু অন্তর্ভুক্ত, তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও মানুষের খুবই কাছাকাছি। কাজেই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে এদের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যে সব প্রাইমেট বর্তমানে জীবিত আছে, তাদের মধ্যে গরিলা এবং শিম্পাঞ্জি মানুষের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। এরা আফ্রিকার অধিবাসী। তার পরেই আসে ওরাংওটাং ; এরা সুমাত্রা ও বোর্নিওর অধিবাসী।

ভারতবর্ষে যে সব প্রাইমেট বাস করে, তাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) লেজহীন মর্কট (Ape)
(খ) লেজবিশিষ্ট বানর (Monkey),
(গ) নিশাচর বৃহৎচক্ষু বানর (Loris)

লেজহীন মর্কট

এদের সাধারণ নাম গিবন। এরা Hylobates গণভুক্ত। এদের ছয়টি বিভিন্ন প্রজাতি (Species) আছে—যারা সাধারণভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা। হাইলোবেটস-এর কেবল দুটি Species ভারতবর্ষে দেখা যায়। তার মধ্যে Hylobates hoolock অতি পরিচিত।

আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান বনাঞ্চলে, যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে এরা বাস করে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে লতাপাতায় আচ্ছাদিত ঝোপের ভিতর থাকতে এরা ভালবাসে। তবে খাবার সময় বহু উঁচু গাছের ডালের উপর উঠে যায় আবার মাটিতে নেমে ঝর্ণার জল পান করে। এরা দিবাচর প্রাণী। এদের খাবার হলো বনজ ফল, পাতা ও ফুল। মাঝে মাঝে পাখীর ডিম এবং বাচ্চা পাখীও খেয়ে থাকে। এরা আদিম যুগের মানুষের মতই কখনও স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে না।

লেজহীন এই মর্কটগুলি দেখতে প্রায় মানুষের মতই লম্বা, এদের সারা শরীর ঘন ঝাঁকড়া লোমে আবৃত। জন্মের সময় দেহের রং হয় ধূসর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের রং হয়ে যায় কালো। যৌবনে স্ত্রী-হাইলোবেটসের

রং থাকে পিঙ্গল বর্ণের। কিন্তু পুরুষের রং কালোই থেকে যায়, কেবল চোখের পাতাগুলি সাদা ঘন লোমে ঢাকা থাকে। মানুষের মতই এদের মোট 32টি দাঁত। বাহু দুটি পায়ের তুলনায় অনেক লম্বা। কখনও কখনও হাতে-পায়ে আবার কখনও মানুষের মত দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে চলাফেরা করে। রাতের বেলায় গাছের ডালে ঘন পত্রগুচ্ছের মধ্যে ঘুমায়।

চিত্র নং 20

শিশু কোলে মা গিবন

বনের মধ্যে এরা ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক-একটি দল হলো এক একটি পরিবার, যার মধ্যে থাকে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী এবং তাদের তিন চারটি বাচ্চা। বাচ্চারা পরিণত বয়স্ক হলে নিজেদের সঙ্গী খুঁজে নিয়ে বাপ-মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক একটি পরিবার জঙ্গলের মধ্যে 250 থেকে 300 একর জায়গা জুড়ে বিচরণ করে এবং তারই মধ্যে উৎপন্ন ফল, ফুল ইত্যাদি

খাবার খায়। এই সীমানার মধ্যে অন্য কোন পরিবার ঢুকে পড়লে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়।

সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা থাকে না। ঋতুকালে (Menstrual cycle) এবং গর্ভবতী অবস্থায়ও স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হয়। স্ত্রী-গিবনের নিয়মিত ঋতুকালের ব্যবধান 20 থেকে 33 দিন এবং 2 থেকে 4 দিন তা স্থায়ী হয়। স্ত্রী গিবন 220 দিন গর্ভধারণের পর মানুষের মতই একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চারা জন্মের পর মায়ের কোলে-পিঠেই পালিত হয়। বাচ্চা প্রায় 2 বছর স্তন্যপান করে এবং 7-8 বছর বয়সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। এদের আয়ুষ্কাল 30 থেকে 32 বছর।

লেজবিশিষ্ট বানর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বানর দেখা যায়। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত শহরে, গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্বত্রই বানর সুপরিচিত। গাছের ফল, পাতা, আলু, ধান, গম এবং ছোট ছোট পোকামাকড়ও খাদ্য হিসাবে এরা গ্রহণ করে থাকে। এরা দিবাচর প্রাণী (21নং চিত্র)।

দেহের উচ্চতায় বিভিন্ন জাতের বানর বিভিন্ন রকমের। এদের হাত-পা দেহের তুলনায় বেশী লম্বা, দেহ নানা রঙের লোমে আবৃত। এদেরও দাঁত

চিত্র নং 21

বানর

মোট 32টি। সাধারণভাবে লম্বা লেজটি গুটিয়ে অথবা উপরের দিকে তুলে হাত ও পায়ে ভর দিয়ে এরা চলাফেরা করে—কখনও আবার দু-পায়ে ভর দিয়েও দাঁড়ায়। এরা এক এক দলে সংখ্যায় অনেকগুলি করে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাবালক পুরুষ-বানর থাকে মাত্র একটি। পুরুষ-বানর দলের

মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দলের নেতৃত্ব করে। স্ত্রী-বানরের কাজ বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালন করা।

ভারতবর্ষে যে বানর হনুমান নামে পরিচিত, তারা এক সঙ্গে তিন থেকে এক-শ' কুড়িটি পর্যন্ত দল বেঁধে বাস করে। একটি দলে সাধারণতঃ যে পুরুষ থাকে, তাকে বলা হয় বীর হনুমান বা দলপতি। বাকী সবাই স্ত্রী-বানর অথবা বাচ্চা। অন্য কোন পুরুষ সেই দলে প্রবেশ করলে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং যে জয়লাভ করে, সেই দলপতি হয়। আবার কোন কোন সময় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটি দলে একাধিক পুরুষও কর্তৃত্ব করে থাকে। স্ত্রী-বানরের মধ্যে যে দলপতিকে বেশী সঙ্গদান করে, সে কিছুটা রাণীর মত কর্তৃত্বে আসীন হয়। কিন্তু সন্তান প্রসব করলেই দলপতির বিরাগভাজন হয়ে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে অবহেলিত অবস্থায় দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

স্ত্রী-হনুমানের ঋতুকাল ত্রিশ দিন অন্তর হয়ে থাকে এবং দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয়। এরা গর্ভবতী হবার 168 দিন পরে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতি যখন বেদনা অনুভব করে তখন তিন থেকে আটটি বানর তাকে ধাত্রীর কাজের জন্যে ঘিরে ধরে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তারা মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাটিকে সরিয়ে নেয় এবং দু-একদিন ধাত্রী বানরেরা এই বাচ্চাকে যত্ন করে—কারণ স্ত্রী-বানরেরা স্বভবতঃই বাচ্চা ভালবাসে, তারপর তারা মায়ের কাছে বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেয় এবং মা তার বুকের দুধ দিয়ে বাচ্চাকে পালন করে। কিন্তু সাধারণতঃ দু-বছরের মধ্যে মায়ের কোলে যদি অন্য সন্তান আসে, তখন মা বাচ্চাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দেয়। মা যদি পুরুষ বাচ্চা প্রসব করে, তবে তার ভয়ের সীমা থাকে না। দলপতি তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে পুরুষ শিশুটিকে সুবিধা পেলেই হত্যা করতে ইতস্ততঃ করে না। কোনক্রমে রক্ষা পেলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে সে দলপতির মন জয় করে এবং দলের মধ্যে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

ভারতবর্ষে যে সব বানর দেখা যায়, এখানে তাদের নাম, প্রাপ্তিস্থান এবং অন্যান্য পরিচিত দেওয়া হলো।

নাম	বাসস্থান	দেহের রং	মুখ	লেজ
1. Macaca radiata ম্যাকাকা রেডিয়েটা (Bonnet Monkey)	গোদাবরী নদী ও সাতারা পর্বতের দক্ষিণাঞ্চল।	ধূসর পিঙ্গলাভ, পেটের তলা ফিকে।	হাল্কা গোলাপী অথবা লালচে, কপালে ছোট ছোট লোম।	দেহের দৈর্ঘ্য থেকে বড়, নরম লোমে আবৃত।

নাম	বাসস্থান	দেহের রং	মুখ	লেজ
2. Macaca silenus ম্যাকাকা সাইলিনাস। (Lion tailed monkey)	পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।	কালো	কালো	দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক অথবা $\frac{2}{3}$ ভাগ। শেষ ভাগে গুচ্ছ লোম থাকে।
3. Macaca mullata ম্যাকাকা মুলেটা। (Rhesus monkey)	সমগ্র উত্তর ভারত।	পিঙ্গল বর্ণের, পেটের তলা ফিকে।	লালচে	দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক, প্রচুর লোম থাকে।
4. Macaca assamensis ম্যাকাকা অ্যাসামেন-সিস (Assamese monkey)	আসাম, সুন্দরবন, মিশমি ও নাগা পার্বত্যাঞ্চল	হলুদ বর্ণ থেকে গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের।	মুখের পাশ লালচে, চোখের তলা কালো।	দেহের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অর্ধেক থেকে $\frac{2}{3}$ ভাগ।
5. Macaca speciosa ম্যাকাকা স্পিসিওসা (Stump tailed monkey)	আসাম	কালচে	লালচে কপাল কোঁচকানো	লেজ দীর্ঘ, লেজে অল্প লোম।
6. Presbytis entellus (Semnopithecus entellus) প্রেসবিটিস এণ্টেলিস (Hunuman monkey)	ভারতের সর্বত্র	ধূসর, কালচে অথবা পিঙ্গল	মুখ খুবই কালো	লেজ দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়।

এই প্রজাতিগুলি ছাড়া স্থানীয় ভাবে প্রতিটি জাতির অনেক উপ-প্রজাতিও ভারতে পাওয়া যায়।

নিশাচর বৃহচ্চক্ষু লোরিস

ভারতে দু-জাতের লোরিস দেখা যায় অর্থাৎ স্লেণ্ডার লরিস (Loris tardigradus) এবং স্লো লোরিস (Nycticebus coucang)। প্রথমোক্ত জন্তুটি দক্ষিণ-ভারতের বাসিন্দা এবং দ্বিতীয়টি আসাম ও ব্রহ্মদেশে দেখা যায়।

এরা সাধারণতঃ গাছের ফল, কীট-পতঙ্গ, ছোট ছোট গিরগিটি ও পাখী খেয়ে জীবন ধারণ করে। রাত্রিবেলা ছাড়া এরা বের হয় না, জঙ্গলের মধ্যে অনেক উচুঁ গাছের ডালে, ঝোপের মধ্যে অথবা কোটরের মধ্যে থাকে।

চিত্র নং 22
লোরিস

দেহ পিঙ্গল বর্ণের লোমে আবৃত, হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান, কান বড় এবং গোলাকার। চোখের আকৃতি দেখে মনে হয় যেন চশমা পরে আছে। স্লেণ্ডার লোরিসের লেজ নেই, স্লো লোরিসের লেজ খুব ছোট এবং লোমে ঢাকা।

এরা সাধারণতঃ একাকী ঘুরে বেড়ায়। দলবদ্ধ অবস্থায় এদের দেখা যায় না। এদের একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, চলবার সময় এরা ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ করে। বোধ হয় ঐ প্রস্রাবের গন্ধ ইচ্ছামত তাদের যে কোন অঞ্চলে বিচরণের সময় নির্ধারিত স্থান নির্ণয়ে সহায়তা করে। এরা সাধারণতঃ 160 দিন গর্ভধারণের পর একটি অথবা কখনও কখনও দু-টি বাচ্চা প্রসব করে। দু-সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত এরা মায়ের স্তন্যপান করে। প্রকৃত পক্ষে এরা অন্য সব প্রাইমেট অপেক্ষা একটু নিম্নস্তরের।

একটি বিতর্কিত পাখী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষীকুলের রাজা হ'ল ঈগল পাখী। সোনালী দেহের উপর তুষার-শুভ্র মাথা, চিলের মত ধারালো বাঁকানো চঞ্চু। সুতীক্ষ্ণ চোখ, অভিজ্ঞ শিকারীর মত দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী এই পাখী এখন সারা আমেরিকায় একটি বিতর্কিত জীব। হাওয়াই ও কানাডা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই এদের বিচরণ। এদের দ্রুত সংখ্যা হ্রাসের ফলে একদিকে পক্ষী বিজ্ঞানীরা যেমন এদের বংশবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট অন্যদিকে মুর্গি ও মেষ ফার্মের মালিক এবং সাধারণ চাষীদের কাছে এরা ঘৃণ্য শয়তান ও চোর নামে অভিহিত। তাদের মুখে এই পাখীদের নির্বংশ করার দাবী আজ সোচ্চার। এরা নাকি ছোট ছোট মেষ শাবক, বাচ্চা মুর্গি ও অন্যান্য জন্তু এমন কি মানব শিশুকেও সুযোগ পেলে তুলে নিয়ে যায় এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে ভক্ষণ করে ; যদিও এদের প্রধান খাদ্য মাছ।

আমেরিকার জাতীয় কংগ্রেস 1782 খৃষ্টাব্দে এই শিকারী পাখীকে তাদের শীলমোহরের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করে। শুধু আমেরিকা নয়, বহু যুগ ধরে বহু দেশে এই পাখীর প্রতিকৃতি শৌর্য, বীর্য ও একনায়কতন্ত্রের প্রতীকচিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হোতো। জারের রাশিয়া, নেপোলিয়ানের ফ্রান্স একে গ্রহণ করেছিল অত্যাচার ও শোষণের প্রতীক হিসাবে।

আকৃতিগত দিক থেকে এরা চিলের মতই। তবে আকারে অনেক বড়। প্রাপ্তবয়স্ক ঈগল ডানা মেললে 7/8 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সারা দেহ বড় বড় সোনালী পালকে ঢাকা। কেবল মাথার পালক সাদা এবং লেজেতেও কিছু সাদা পালক দেখা যায়। ডানার পালকগুলি 20 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়, চঞ্চু অত্যন্ত ধারালো ও তীক্ষ্ণ—যা মাংস ছিঁড়ে খেতে সাহায্য করে। পায়ের নখও খুবই বড় বড় এবং সূচের মত তীক্ষ্ণ। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। উড়তে উড়তে এরা 10,000 হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে পারে। তারপর ডানা মেলে দেহকে চিলের মত ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে শিকারের সন্ধান করে। তিন মাইল উঁচু থেকেও এরা মাছ বা ছোট মুর্গি-শাবককে দেখতে পেলে নীচের দিকে নেমে এসে ছোঁ মেরে তুলে নেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে এরা কিন্তু ভয়ানক স্নেহশীল ও সন্তানবৎসল এবং গৃহপ্রেমিক। কোনও পাখীই বোধহয় তার আবাসস্থলকে এত বেশী ভালবাসে না। সাধারণতঃ শিকার সন্ধানের সময় ছাড়া এরা আবাসস্থল ত্যাগ করে না। অধিকাংশ ঈগল বছরের শেষে নূতন বাসা তৈরী করে। আবার কেউ বা একই

বাসায় সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। এদের আয়ুষ্কাল যেহেতু দীর্ঘ তাই বাসাটিও কাঠকুটো সংগ্রহের দ্বারা বৃহৎ আকার ধারণ করে। ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি পাহাড়ে একবার একটি সুবৃহৎ ঈগলের বাসা দেখা গিয়েছিল। বাইরেটা তার কাঠের টুকরো এবং গাছের শাখা দিয়ে তৈরী, ভিতরটা ঘাস, মস্ প্রভৃতি নরম বস্তু দিয়ে তৈরী। সমগ্র বাসাটির ওজন হবে কয়েক টন।

বহু পাখীর সম্বন্ধেই শোনা যায় একবার তারা জীবনসঙ্গী খুঁজে পেলে আমৃত্যু পরস্পরের সাথী হয়ে থাকে। অবশ্য অন্য পাখীদের সম্বন্ধে কতটা সত্যি জানি না, কিন্তু ঈগলের জীবন-সঙ্গিনী আমৃত্যু সাথী। ঈগল দম্পতি পরস্পরকে নিদারুণ ভালবাসে। যদি হঠাৎ মৃত্যু এসে দুজনের মধ্যে একজনকে ছিনিয়ে নেয় তবে যে বেঁচে থাকে সেই নিঃসঙ্গ শোকার্ত ঈগল তার স্থায়ী আবাসস্থল ত্যাগ করে খোলা আকাশের নীচে একাকী বিচরণ করে। দীর্ঘদিন শোক পালনের পর যদি সে আবার মনের মত সঙ্গী খুঁজে পায় তবেই সে পুনরায় বাসা বাঁধে।

বিচিত্র এদের প্রণয়লীলা। সারা বছর দুজনে মনের সুখে আকাশে-বাতাসে, গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়। বড় ধরনের শিকার পেলে উভয়ে ভাগ করে খায়। সাধারণতঃ খুব উঁচু গাছের ডালে এরা স্থায়ী বাসা বাঁধে। নভেম্বর মাস থেকে জুন পর্যন্ত এদের আর এক জীবন। এই সময়ের মধ্যেই এরা ডিম পাড়ে। ডিমে উত্তাপ দেয় এবং বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। তাই নভেম্বর থেকে শুরু হয় উভয়ের মধ্যে প্রণয়লীলা। পরস্পরের প্রতি তারা জ্বালাময় প্রেম নিবেদন করে, যতদিন না ডিম পাড়ে ততদিন সূর্যোদয়ের আগে ভোরবেলা এবং সূর্যাস্তের পর গোধূলি লগ্নে এদের মিলন হয়। পক্ষীবিদরা বলেন ছায়ায় ঘেরা গাছের মাথায় গোধূলি লগ্নে ওদের মিলন-কালীন ওরা এমন এক বন্য শব্দ উচ্চারণ করে যা নির্জনতায় ভীষণ ভয় করে। যারা এই শব্দ চেনে না একে কোন এক অশরীরী অপদেবতার করুণ কান্না বলে মনে করে।

স্ত্রী-ঈগল একসঙ্গে সাধারণতঃ দুটি ডিম পাড়ে। দেহের ওজনের তুলনায় ডিম দুটি খুবই ছোট। প্রায় 35 দিন একটানা ডিমে উত্তাপ দেবার পর বাচ্চা ফুটে বের হয়। স্ত্রী-পুরুষে পালা করে ডিমে উত্তাপ দেয়। একটি ঈগল একটানা 72 ঘণ্টা ডিমের উপর বসে থাকার পর সাঙ্কেতিক শব্দে তার সাথীকে সংবাদ পাঠায়। আবাসস্থলের কাছাকাছি খাদ্যান্বেষণে রত সাথী এই সাঙ্কেতিক শব্দ পেয়ে বাসায় ফিরে আসে। অন্যটি তখন খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে যায়। যদি কোন কারণে একসঙ্গে দুজনকে বাসা ছেড়ে যেতে হয় তাহলে এমনভাবে ডিমগুলিকে শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দেয় যেন বাসাটি পরিত্যক্ত বলে মনে হয়।

এরপর শুরু হয় বাচ্চাদের লালন-পালন ও শিক্ষা। ঈগল ছানা জন্মের

সময় আকারে অতি ক্ষুদ্র। শৈশবকাল অনেক দীর্ঘ। এই সময় তার মা-বাবার কাছে শিকার করা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে, একেবারে শিশু অবস্থায় মা-বাবা টুকরো টুকরো খাবার নিজেদের চঞ্চু দিয়ে বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। তারপর একটু বড় হলে মাছ ধরে এনে বাচ্চাদের সামনে টুকরো করে দেখিয়ে দেয় কেমন করে মাছকে টুকরো করতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গোটামাছ ধরে এনে বাচ্চাদের টুকরো করতে দেয়। এইভাবেই শিকার পদ্ধতি শিক্ষালাভ হয়।

বাচ্চা ঈগলগুলি খুবই দুরন্ত। বাসার মধ্যে ভীষণ লাফালাফি করে। খড়কুটো নিয়ে খেলা করে। দুষ্টু ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণে মা-বাবার চিন্তার অন্ত নেই। সব সময় চোখে চোখে রাখে—যাতে অন্যমনস্ক হয়ে গাছের নীচে পড়ে না যায়।

বাচ্চা অবস্থায় পালকের রং ধূসর এবং গঠন ভিন্ন ধরনের। উড়তে শেখার আগে ঐসব পালক ঝরে যায়। ডানায় পালক গজাবার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবা বাচ্চাদের উড়তে শেখায়। কিভাবে ডানার উপর ভারসাম্য রাখতে হয়, গতি পরিবর্তন করতে হয়, উঁচুতে উঠতে হয়, নীচে নামতে হয় তা মা-বাবা উড়ে উড়ে যত্ন সহকারে দেখিয়ে দেয়। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ শিক্ষাদানের পর একদিন উড়তে শেখার প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়।

অবশেষে একদিন সত্যই তারা উড়তে শেখে। মা-বাবাকে দেখাবার জন্য তাদের সামনে বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। তবে বেশী দূরে নয়; আবার তখনই ফিরে আসে। বাচ্চাদের উড়তে দেখে মা-বাবাও পুলকিত হয়। কিন্তু যদি কোন বাচ্চা উড়তে শিখেও ওড়ার চেষ্টা না করে তাহলে বাবা-মা ভীষণ কঠোরতা অবলম্বন করে। খাবার এনে দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অথবা খাবার এনে খানিকটা দূরে রেখে আসে যাতে বাচ্চা উড়ে গিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু সত্যই যেদিন তারা ভালভাবে উড়তে শেখে তখন মা-বাবা তাদের অনেক খাবার দিয়ে পুরস্কৃত করে।

ধীরে ধীরে তারা যত বড় হতে থাকে বালক-বালিকার মত ততই তার বাড়ীতে কম সময় কাটায়। তারপর এক বছর বয়ঃক্রম অতীত হলে একদিন তারা নিজেদের সৌভাগ্য সন্ধানে বের হয়। সাধারণতঃ আর ফিরে আসে না। নিজেরা বাসা বাঁধে। চার বছর বয়স অতীত হলে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। মাথায় তখন শ্বেতশুভ্র পালক গজায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে প্রণয় নিবেদন করে এবং বংশবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। ঈগল পাখী 30 বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।

ব্যক্তি-জীবনে ঈগল অত্যন্ত প্রেমময়, স্নেহশীল ও আভিজাত্যপূর্ণ হলেও মানব সমাজে তার পরিচয় ঘৃণ্য, শয়তান, অত্যাচারী ও শোষকের প্রতীক হিসাবে। তাই সে বিতর্কিত।

বর্তমানে ঈগলের বংশবৃদ্ধির হার দ্রুত কমে আসছে। কৃষিক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ

নাশের জন্য বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের ফলে কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয়। ঐ সব কীটপতঙ্গ খেয়ে প্রচুর মাছেরও মৃত্যু হয় এবং ঐ সব মাছ খেয়ে এমনিতেই ঈগলের প্রজনন শক্তি হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া চাষীরাও দেখতে পেলেই গুলি করে। তাই যুক্তরাষ্ট্র সরকার আইন করে ঈগল শিকার বন্ধ করে দিয়েছে।

চিত্র নং 23
ঈগল পাখী

দৌড়নো-পাখী

পাখী হলো প্রকৃতি জগতের এক বিচিত্র সৃষ্টি। উড়ন্ত পাখীদের বলা হয় 'প্রকৃতির স্বাভাবিক বিমান'। মনুষ্যসৃষ্ট বিমানের চেয়েও যন্ত্রপাতি তার নিখুঁত। কিন্তু যে সমস্ত পাখী মোটেই উড়তে পারে না, তাদের দৈহিক গঠন, বাসস্থান এবং স্বভাব অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

বিশ্বের বর্তমান পক্ষিকুলকে দুটি বৃহৎ বিভাগে ভাগ করা হয়।

ক) উড়ন্ত পাখী

খ) দৌড়নো পাখী

সাধারণ দৃষ্টিতে যদিও এই দুই বিভাগের প্রাণীরাই পাখী, কিন্তু এদের মধ্যে তফাৎ অনেক। উড়ন্ত পাখীদের দৈহিক গঠন এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যা কেবল বিমানের সঙ্গেই তুলনা চলে। অপর পক্ষে দৌড়নো-পাখীদের দৈহিক গঠনের রূপান্তর দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রাণীদের সঙ্গেই বেশী মিলে।

যদিও সরীসৃপ থেকে পাখীদের উৎপত্তি; কিন্তু দু-বিভাগের পাখীদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন উড়ন্ত পাখী থেকেই দৌড়নো-পাখীদের উৎপত্তি। দীর্ঘকাল স্থলচর হিসাবে জীবন যাপনের জন্যে ডানা ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ অব্যবহারের ফলে লুপ্ত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে! সুতরাং উড়ন্ত পাখীদের পরে এদের উৎপত্তি।

আবার অন্য একদল বিজ্ঞানী মনে করেন উড়ন্ত পাখী ও দৌড়নো-পাখীদের বংশধর দুই ভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ। সুতরাং বর্তমান দু-বিভাগের পাখীই নিজ নিজ পরিণতি লাভ করেছে এবং তাদের উৎপত্তিও সমসাময়িক।

বর্তমান প্রবন্ধে দৌড়নো-পাখী আলোচ্য বিষয়।

উট পাখী

বহু প্রাচীনকাল থেকে উটপাখী মানুষের পরিচিত। এদের পালক দিয়ে তৈরী হয় বিচিত্র পোষাক। অতীতে আফ্রিকায় মানুষেরা ঐ পোষাক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতো এবং এখনও করে থাকে। এদের মাংস অবশ্য সুখাদ্য নয়।

বর্তমানে আফ্রিকা ও আরবের মরুভূমি অঞ্চলে এবং মেসোপটেমিয়ায় এরা

বাস করে। এদের জীবাশ্ম (Fossil) ভারতের শিবালিক পর্বতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এককালে এরা এশিয়াতেও ছিল। সাধারণতঃ শুষ্ক ভূমিতে এরা বাস করে।

বিশ্বের বৃহত্তম পাখী হলো উটপাখী। ঘাড় তুললে মাটি থেকে আট নয় ফুট পর্যন্ত দেহটি উঁচু। ওজন কয়েক মণ। দেহ কাল পালকে ঢাকা। অকেজো ডানা ও লেজ সাদা। গলা ও পায়ের জংঘা মাংসের মত লাল্চে। ঐ স্থানগুলিতে হলুদ রঙের সরু সরু চুলের মত অল্প কিছু পালক থাকে। স্ত্রী-

চিত্র নং 24
উট পাখী

ও বাচ্চা পুরুষেরা ছাই রঙের। দ্রুত দৌড়বার জন্যে পা দুটি অত্যন্ত মজবুত, আঙুল দুটি করে, নখ ছোট ও ভোঁতা। বালি অথবা শক্ত বস্তুর উপর দিয়ে দ্রুত দৌড়বার উপযোগী আঙুলের তলায় পুরু প্যাড আছে। মাথা শরীরের তুলনায় ছোট, চক্ষু চওড়া; মুখের হাঁ বড়, ঘাড় অত্যন্ত লম্বা। নানা প্রজাতির উটপাখী আছে।

মরুভূমিই এদের প্রিয় বাসস্থান। ঘোড়া ছাড়া সব জন্তুর চেয়ে এরা দ্রুত দৌড়ায়। প্রতি পদক্ষেপে 25 ফুট ব্যবধান থাকে। দৌড়বার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য ডানা মেলে ধরে। কিন্তু গতিপথ বৃত্তাকার। তাই অশ্বারোহী শিকারীরা

সহজেই এদের গতিপথ নির্ণয় করে ধরে ফেলে। এরা মরুভূমির অন্যতম দ্রুতগামী জন্তু এবং জিরাফ, কৃষ্ণশামৃগ প্রভৃতির সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঝোপের মধ্যে দেহটি লুকিয়ে কেবলমাত্র মাথাটুকু তুলে শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখে।

সাধারণভাবে এরা শান্ত, কিন্তু রেগে গেলে সিংহের মত গর্জন করে। এদের খাদ্য উদ্ভিদ ; কিন্তু কখনও কখনও স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এরা দীর্ঘদিন জল না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

সাধারণতঃ এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। একটি দলে একটি মাত্র পুরুষ এবং পাঁচ ছয়টি স্ত্রী-পাখী থাকে। কখনও কখনও স্ত্রী-পাখীর সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশটিও হতে পারে। ডিম পারবার পূর্বে স্ত্রী-উটপাখীর অধিকার নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ হয়, মারামারির সময় এরা পা এবং চঞ্চু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পায়ের ধাক্কা বিপদজনক। কখনও কখনও বিচিত্র ভাবভঙ্গীর সাহায্যেও স্ত্রী-উটপাখীর মনোরঞ্জন করে।

ডিম পাড়ার আগে পুরুষ পাখী বালির মধ্যে গর্ত করে একটি বাসা তৈরী করে। পুরুষের অধীনস্থ সমস্ত স্ত্রী-পাখীই একটি গর্তে ডিম পাড়ে। গর্তের মধ্যে তিরিশ-চল্লিশটি পর্যন্ত ডিম দেখা গেছে এবং মূলত পুরুষ পাখীই ডিমে তা দেয়। বাসার আশেপাশে কিছু ডিম ছড়ানো থাকে। বাচ্চারা ঐগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বাচ্চা ফুটতে ছয়-সাত সপ্তাহ সময় লাগে। অতিরিক্ত সূর্যতাপ থাকলে ডিমে তা দেবার প্রয়োজন হয় না। ডিম অত্যন্ত বড়। উপজাতিরা উটপাখীর ডিমের খোল পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

রিয়া

রিয়া সাধারণতঃ আমেরিকান উটপাখী নামে পরিচিত। উটপাখীর সঙ্গে দেহের গঠন এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেক মিল আছে ; তবে আকারে ছোট। এদের পালক দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা নানা রকম শৌখিন বস্তু তৈরী করে।

দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার পোম্পাই অঞ্চলে এরা বাস করে।

উটপাখীর চেয়ে আকারে এরা কয়েক ফুট ছোট। বিভিন্ন প্রজাতির রিয়ার গায়ের রং বিভিন্ন রকমের। ডানা একটু বড়। মাথা, ঘাড় এবং উরুতে পালক আছে। দ্রুত দৌড়বার জন্যে পা দুটি শক্তভাবে তৈরী। পায়ে আঙুলের সংখ্যা তিন ; নখ ধারালো।

সাধারণতঃ গাছবিহীন শুষ্ক মরুভূমিতে এরা বাস করে। দৃষ্টিশক্তি প্রখর। দৌড়বার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ডানা মেলে থাকে। উটপাখীর

মতই এরা বৃত্তাকারে দৌড়য় এবং হরিণদলের সঙ্গে ঘুরতে ভালবাসে। ঘাস, মূল, পতঙ্গ, শামুক, কিন্নর, গিরগিটি প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

এদের মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য বেশী। একটি দলে একটি পুরুষ এবং

চিত্র নং 25
রিয়া

পাঁচ থেকে তিরিশটি পর্যন্ত স্ত্রী-পাখী থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। একই গর্তে স্ত্রী-পাখীরা ডিম পাড়ে। পুরুষ পাখী 20 থেকে 30টি ডিম একসঙ্গে তা দেয়। আশেপাশে ছড়ানো ডিমগুলি বাচ্চারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পাঁচ-ছয় সপ্তাহ বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

ক্যাসোয়ারী

ক্যাসোয়ারী পাখী আকারে উটপাখী এবং এমুর পরে। এদের চুলের মত লম্বা পালক দিয়ে তৈরী হয় নানাবিধ পোষাকী বস্তু এবং কম্বল ও মাদুর। এদের মাংসও সুস্বাদু। এদের বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া এবং নিকটবর্তী দ্বীপ-সমূহে। স্থানীয় বাসিন্দারা এদের পোষ মানিয়ে মুরগীর মত পালন করে। শিকারীরা অরণ্যে কুকুর নিয়ে এদের শিকার করে।

এদের ডানা দুটি লুপ্তপ্রায় এবং অকেজো। দেহের আবৃত পালকগুলি যথেষ্ট লম্বা এবং চুলের মত। লেজে বিশেষ পালক নেই। গায়ের রং

পালকের জন্য কালো। ঘাড় এবং মাথা প্রায় পালকশূন্য। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—মাথার উপর অস্থিকলা নির্মিত একটি বড় ঝুঁটি থাকে। পা দুটি লম্বা, তিনটি করে ধারালো নখযুক্ত আঙুল। এই পাখীর বেশ কয়েকটি প্রজাতি এখনও জীবিত আছে।
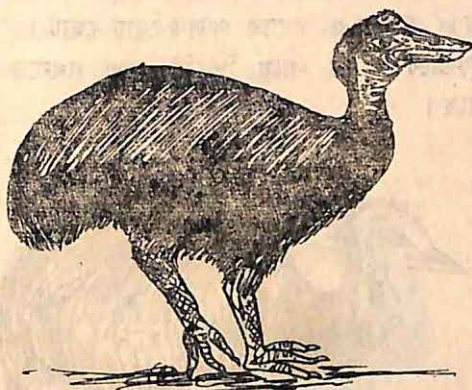
চিত্র নং 26
ক্যাসোয়ারী

ক্যাসোয়ারী জাতির সমস্ত পাখী বনাঞ্চলে থাকে। এরা সূর্যের আলো পছন্দ করে না। খাদ্যান্বেষণের জন্যে সকাল-সন্ধ্যায় ঝোপঝাড়যুক্ত খোলা মাঠে বের হয়। গাছের ফল ও পোকামাকড় এদের খাদ্য। এরা অত্যন্ত দ্রুতগামী। নিমেষে চোখের আড়ালে চলে যায়। ঘুমাবার সময় বুক পেতে ঘুমায়। অবসর সময়ে নাচে, খেলা করে। বয়স্ক পুরুষেরা রেগে গেলে পা ছোঁড়ে এবং পালক কুঞ্চিত করে।

বর্ষাকালে বড় বড় নদীতে এরা সাঁতার কাটে; সমুদ্রেও স্নান করে। এদের জোরালো কণ্ঠস্বর এক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। বাচ্চাদের ডাকবার সময় স্বর নীচু, উত্তেজনায় ঘুৎ-ঘুৎ শব্দ করে। স্ত্রীরা শান্ত, কখনও কখনও বাঁশীর মত শব্দ করে।

ডিম পাড়বার সময় এরা জোড় বাঁধে। ঝোপের নীচের পাতা ও ঘাস দিয়ে বাসা করে। স্ত্রীরা পাঁচ-ছয়টি ডিম পাড়ে। পুরুষ তা দেয়। সাত সপ্তাহ পরে বাচ্চারা একটু বড় হলে গোটা পরিবারকে দল বেঁধে ঘুরতে দেখা যায়।

এমু

এমু আকারে উটপাখী থেকে ছোট; কিন্তু ক্যাসোয়ারী থেকে বড়। স্থানীয়

অধিবাসীরা এদের মাংস খুব পছন্দ করে এবং চামড়ার নীচের চর্বিস্তর সংগ্রহ করে তেল উৎপাদন করে। এরা সহজেই পোষ মানে। এদের বাসস্থান পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া।

উট পাখীর চেয়ে এদের পা দুটি ছোট হলেও উচ্চতায় পাঁচ ফুট। ডানা লুপ্তপ্রায়। সাদা ও কালো পালকে দেহ আবৃত। গলায় একটি বড় থলি কাছে, চঞ্চু চওড়া। মাথায় ও ঘাড়ের পালক ছোট ছোট। ঝুঁটি নেই, গলায় লতি নেই। দৃঢ়ভাবে গঠিত পায়ে তিনটি করে নখযুক্ত আঙ্গুল। এদের দুটি প্রজাতি আছে।
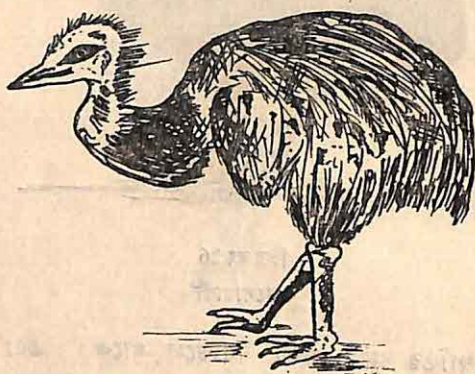
চিত্র নং 27
এমু

এদের স্বভাব মোটামুটি ক্যাসোয়ারীর মত। তবে খোলা বালুকাময় প্রান্তরে বিচরণ করে ; যদিও জঙ্গলেও এদের দেখা যায়। সূর্যালোক পছন্দ করে না, দ্রুত দৌড়ায়। দৃষ্টিশক্তি প্রখর। ফল ও শিকড় প্রধান খাদ্য। এরা নিয়মিত জলপান করে, ভাল সাঁতার জানে। সাধারণতঃ হ্রস্ব শব্দ উচ্চারণ করে।

গর্তের মধ্যে স্ত্রী-পাখী ছয়-সাতটি ডিম পাড়ে, পুরুষরাই তা দেয়। কখনও কখনও স্ত্রীরাও তা দেয়, আট সপ্তাহ পরে বাচ্চা হয়।

কিউই

দৌড়নো-পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো কিউই। অবশ্য টিনোমাস পাখীকেও যদি দৌড়নো-পাখী বলে গণ্য করা হয়, তাহলে সেটিই হবে সবচেয়ে ছোট দৌড়নো-পাখী। তবে টিনোমাসের এই দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে মতবিরোধ

আছে। কিউইয়ের ডিম ও মাংস স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই পছন্দ করে। পালক নিয়েও নানা পোষাকী জিনিষ তৈরী হয়।

এদের বাসস্থান নিউজিল্যাণ্ড ও আশ-পাশের দ্বীপাঞ্চল।

এদের দেহের আকার ছোট ;—ক্রমশঃ সরু, লম্বা, নীচের দিকে বাঁকানো চঞ্চু, যার প্রায় অগ্রভাগে নাসারন্ধ্র অবস্থিত। মাথা, চোখ, ঘাড় এবং পা তুলনামূলকভাবে ছোট। পায়ে তিনটি করে আঙ্গুল ও একটি বুড়ো আঙ্গুল; ধারালো নখ। পা অনেক পিছনে অবস্থিত। ডানা ও লেজ লুপ্তপ্রায়। মাথা ও দেহ সরু চুলের মত পালকে আবৃত। এদেরও কয়েকটি প্রজাতি আছে।
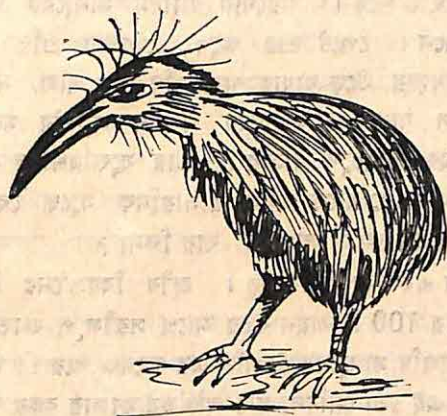
চিত্র নং 28
কিউই

পাহাড়ী বনাঞ্চলে এরা বাস করে এবং ঢালু পাহাড়ের গায়ে গর্তের মধ্যে থাকে। এরা নিশাচর পাখী, দিনের বেলায় গর্তের মধ্যে গোল হয়ে ঘুমায়। রাতে চলবার সময় দু-পায়ে ভর করে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়; আবার ঘাড় নামিয়েও চলে। সরু চঞ্চু দিয়ে পোকামাকড় এবং কেঁচো ধরে খায়। হাঁটবার সময় প্রতি পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য প্রায় এক গজ। এরা অত্যন্ত স্পর্শ ও গন্ধসচেতন এবং সন্ধ্যার সময় বাঁশীর মত শব্দ করে।

ডিম পাড়বার সময় স্ত্রী-পাখী নখের সাহায্যে মাটিতে গর্ত করে এবং এক জোড়া ডিম পাড়ে। পুরুষ ডিমে তা দেয় এবং বাচ্চা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সাম্প্রতিককালে দুটি দৌড়নো-পাখী পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া, যা উট পাখীর চেয়ে আকারে বড় ছিল এবং ম্যাডাগাস্কারের হস্তী-পাখী। হস্তী-পাখীর দেহ হাতীর মতই বড় ছিল। ঐ পাখীর ডিমের খোলা আজও কারো কারো কাছে রয়ে গেছে, যা পানীয় জলের আধার হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং তাতে প্রায় দু-গ্যালন জল ধরে।

পাখী ও মানব সভ্যতা

একটা পাখী উড়ে গেলো। কবির লেখনী কাগজের উপর দাগ কাটলো—"আমি যদি হতেম ছোট পাখী" ? বিজ্ঞানী টেলিস্কোপ নিয়ে বসে দেখলো—প্রকৃতির এই হাওয়াই জাহাজ, জাম্বো জেটের চেয়ে কত নিখুঁত ভাবে উড়তে পারে। কোন দুর্ঘটনার সংবাদ নেই। এই জাহাজের কল-কব্জাগুলির অনুসন্ধানে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অরণ্যের আদিম মানুষের তীরটা ছুটে যায় অব্যর্থ লক্ষ্যের সন্ধানে। পেটে তার ক্ষুধা, দেহটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। কারুশিল্পী খুঁজে বেড়ায়, উড়ে যাবার পথে যদি তার লাল, নীল, সবুজ কোন একটি পালক খসে যায়, তবে তার শিল্প সৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠবে প্রাকৃতিক রং-এর এক অপরূপ বাহার। আর যুদ্ধবিশারদ লক্ষ্য করে ঘণ্টায় তার গতি কত ? জীবাণু যুদ্ধে অথবা রাসায়নিক যুদ্ধে কোন দেশে মানুষ মারার কাজে ঐ পাখীকে কাজে লাগানো যায় কিনা ?

পাখী প্রকৃতির এক অবাক বিস্ময়। জীব বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রায় 100 মিলিয়ন বছর আগে সরীসৃপ জাতীয় জন্তু থেকেই এদের উৎপত্তি। আদি মানুষের উৎপত্তি এর অনেক পরে। আর সভ্য মানুষের সমাজ গড়ে উঠলো এই তো সেদিন, মাত্র পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে।

কিন্তু মানব সভ্যতার সাথে সাথে পাখীও যেন কিভাবে জড়িয়ে পড়লো মানুষের সমাজে। মানুষের জীবনযাত্রায় নানাভাবে তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

আদিম মানুষ পাখীকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে দেখেনি। গ্রহণ করেছিল আদিম প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্যই। কৃষিকার্যে অনভিজ্ঞ মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল ক্ষুধার নিবৃত্তি। সুতরাং পাখীকে গ্রহণ করল তারা উপাদের সহজলভ্য খাদ্য হিসেবে। দলে দলে শিকারীরা বেরিয়ে পড়ত তীর ধনুক নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, বুনো মুরগী, পায়রা ও সামুদ্রিক পাখীকেও হত্যা করতে। ফলে বহু পাখী পৃথিবী থেকে একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে গেল। 1860 সাল পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডে মোয়া পাখী (Moa) এবং আইসল্যাণ্ডে গ্রেট অক্ (Great Auk) পাখী সশরীরে উড়ে বেড়াত। কিন্তু আজ আর তাদের অস্তিত্ব নেই।

আজও সভ্য সমাজে পাখীর মাংস ও ডিমের চাহিদা মোটেই কমেনি, বরং বেড়েছে। তাই তারা পাখীদের নির্বংশ করার চেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করার পক্ষপাতি বেশী। বহু পাখীকে পোষ মানিয়ে তাদের বাসস্থান,

খাদ্য ও বংশবৃদ্ধির প্রকৃতি লক্ষ্য করে গড়ে তুললো পক্ষীপালন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

চীনে এক ধরনের পাখী আছে (Swift) যারা মুখের লালা দিয়ে সুন্দর ভাবে বাসা তৈরী করে। চীনারা এই পাখীর চেয়ে তার বাসাটি খাদ্য হিসাবে বেশী পছন্দ করে।

পাখীর পালক মানুষের কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ। তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলে এবং শীতপ্রধান দেশে আদিম মানুষেরা লজ্জা নিবারণের জন্য পাখীর পালক দিয়ে তৈরী করত অদ্ভুত এক ধরনের বাহারী গরম পোষাক। পাখীর পালক জলে ভেজে না (Water proof) এবং এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হয় না (Non-conductor)। ফলে অনেকে পালক দিয়ে কুঁড়ে ঘরের ছাউনী তৈরী করত।

আধুনিক সভ্য সমাজেও পাখীদের বুকের কাছের নরম পালক দিয়ে তৈরী হয় বালিশ ও বিছানা। বড় বড় রঙ্গীন পালক দিয়ে তৈরী করে বাহারী টুপি। আমেরিকান মহিলারা পাখীর পালক দিয়ে তৈরী টুপি পরতে খুবই পছন্দ করে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সান্তকূজ দ্বীপের অধিবাসীরা মধু ভক্ষণকারী এক ধরনের পাখীদের পীত আভাযুক্ত লোহিত পালক দিয়ে সুন্দরভাবে এক রকমের বেল্ট তৈরী করে। ঐ বেল্ট তাদের কাছে মুদ্রা হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং মাত্র দশটি ঐ রকম সৌখীন বেল্টের পরিবর্তে বিয়ের জন্য একটি সুন্দর কনেও কেনা যায়।

শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখীকে দিয়ে দূতের কাজ করান, মানুষের বহুদিনের অভ্যাস। তীর ধনুক নিয়ে শিকারীরা গভীর অরণ্যে যখন শিকার করতে যায়, সঙ্গে নেয় পোষা পাখী। অগ্রগামী দূত হিসেবে শিকারীর হাত থেকে উড়ে যায় আগে আগে। হিংস্র জন্তুর অবস্থানগুলি শিকারীকে জানিয়ে দেয় বিচিত্র ভাষায়।

তাছাড়া এই সেদিন পর্যন্ত যানবাহনের অভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখী ডাকবহনের কাজ করত। রাজার বাহিনী হিসাবে যেমন সে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের খবর বয়ে আনত, তেমনি আবার রাজকুমারীর মনের খবর গোপনে পেঁছে দিত মনের মানুষের কাছে।

সভ্য সমাজে পাখীর অবদান আরো অনেক। জনবসতিহীন ছোট ছোট সামুদ্রিক দ্বীপগুলিতে যে হাজার হাজার পাখী বাস করে, মানুষ ছোটে সেখানে নৌকা অথবা স্টীমার নিয়ে তাদের বিষ্ঠাগুলি বস্তা ভর্তি করে আনতে। জৈবিক সার হিসাবে তার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক।

মাংসাশী পাখী, কাঁকড়া বিছা, সাপ প্রভৃতি জন্তুকে খেয়ে মানুষের অনেক প্রাকৃতিক শত্রুকে নিধন করে। শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী মরা গরু ও

বাছুরকে খেয়ে পৃথিবীকে আবর্জনামুক্ত করে এবং রোগ বীজাণুর বিস্তার বন্ধ করে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় পাখীর পালক ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। পাখীর যকৃত ও ডিম থেকে তৈরী হয় নানা ঔষধ।

অনেক পাখী মানুষের ভাষাকেও আয়ত্ত করে। এইভাবে টিয়া, কাকাতুয়া, বুলবুল পাখীকে মানুষ ভাষা শিখিয়ে নানা ধরনের কাজে লাগায়। সার্কাস দলে পাখীদের বিচিত্র খেলা একটি বিশেষ অঙ্গ।

পাখীদের গান, নাচ, পালক ও রঙের বৈচিত্র্য মানুষের অবসাদ দূর করে। তাই পাখী পালনের শখ একটি বিচিত্র নেশা হিসাবে দেখা যায়।

মানুষের অজান্তেও তারা মানুষের অনেক কাজ করে। ফুলের মধু সংগ্রহের জন্য যখন তারা বনান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তখন তারা ফুলের রেণু বহন করে এবং পরাগ সংযোগে সহায়তা করে। ফলের সন্ধানে গিয়ে তারা ফল ও বীজের বিস্তারসাধন করে—এইভাবে গড়ে ওঠে নূতন অরণ্য।

তাছাড়া বহু পাখী শস্যক্ষেত্রের রক্ষী হিসেবেও কাজ করে। তার ধান, গম ও ফলের বাগানের পোকাগুলি বেছে খেয়ে নেয় এবং ইঁদুরকেও ধ্বংস করে।

তাই বলে পাখীমাত্রই মানবসমাজের বন্ধু নয়। অনেক পাখী ধান, গম, ডাল, ফল ও বীজ খেয়ে ফেলে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট করে। তাছাড়া বহু রোগও পাখীর দ্বারা বিস্তারলাভ করে। কিছু পাখী মৌমাছি ও মধু খেয়ে 'মৌমাছি পালন' শিল্পকে ধ্বংস করে।

মোটের উপর ভালোয়-মন্দে মিশিয়ে মানবসভ্যতায় পাখীদের এক অনস্বীকার্য অবদান আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। সমুদ্র পরিচয়/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সংকর্ষণ রায়/৮·০০
৮। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৬·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬·০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ/১২·০০
১৭। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবকসী/৯·০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক/১২·০০
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য/সংকর্ষণ রায়/১০·০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
২২। আমাদের জীবনে পাখী/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪·০০
২৩। জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৪। আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসু/১০·০০

আট টাকা